ঈমান ও সহীহ্ আক্বীদাহ্

আল্লাহ কি নিরাকার, সর্বত্র বিরাজমান?

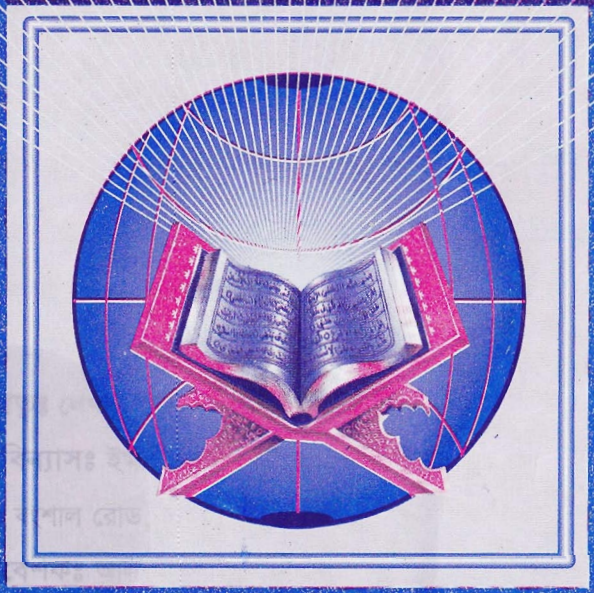

হাফেয মুহাম্মাদ আইয়ূব

আল-ইসলাহ্ প্রকাশনী

بسم الله الرحمن الرحيم

অভিমত

মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবিয়া যাত্রাবাড়ীর ভাইস প্রিন্সিপাল প্রবীণ আলিম শায়খুল হাদীস মাওলানা আহমাদুল্লাহ রহমানী নাসিরাবাদী সাহেব বলেনঃ

যত প্রকার অপরাধ অনাচার রয়েছে তার মধ্যে শির্‌ক হল আল্লাহর নিকট জঘন্যতম এবং অতি মারাত্মক অপরাধ। পবিত্র কুরআনে কারীমে, আল্লাহ তায়ালা শির্‌ককে ক্ষমা করবেন না বলে ঘোষণা দিয়েছেন। বর্তমানে আমাদের দেশে শির্‌ক বিদ'আতের মহড়া চলছে। বিভিন্ন স্থানে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠা খানকা দরবার ও মাজার এর অন্ত নাই। তার মধ্যে আবার কত মাজার আছে কৃত্রিম। জনগণ ভন্ড ফকীরদের খপ্পরে পড়ে ঈমান আক্বীদাহ নষ্ট করছে। প্রকৃত ঈমানী শিক্ষা হতে অধিকাংশ মানুষ এখনও বঞ্চিত। আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেরূপ আদিষ্ট যে, একনিষ্ঠভাবে কেবলই আল্লাহর 'ইবাদাত ও বন্দেগী করতে হবে, তার উপরই ভরসা করতে হবে। সাহায্য তার নিকটেই চাইতে হবে। তার নিকটেই সমস্ত নিবেদন পেশ করতে হবে। আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর নির্দেশ পালন কর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ কর। যেমনই ইত'আত করতে হবে আল্লাহর সে রকমভাবেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর ইত'আত করতে হবে। মোহাব্বত যেমনভাবে আল্লাহর সাথে করতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথেও তেমনি করতে হবে। আল্লাহর ভালবাসা নির্ভর করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরনের উপর। শিরক বিদ'আত হতে দূরে থাকতে হবে। এতে কোন সন্দেহ নাই যে, শির্‌ক মহাপাপ। যলমে আযীম। এদিকে লক্ষ্য করে হাফিয আইয়ূব সাহেব বিভিন্নভাবে শিরক, কুফুর ও বিদ'আতের অন্ধকার হতে সঠিক আক্বীদাহ ও ঈমানের আলোর দিকে জনগণকে ফিরে আনার জন্য অনবরত কাজ চলিয়ে যাচ্ছেন। তিনি ইতিমধ্যে পুস্তিকা লিখে ও আহলে হাদীস দর্পণের মাধ্যমে বিভিন্ন ইসলামী মাসায়েল ও মাজামীন পেশ করে ওলামাগণকে সঠিক সিদ্ধান্তের দিকে আনার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং লেখা-লেখির মাধ্যমে যোগ্যতা অর্জনের জন্য সচেষ্ট আছেন। আমি তার এই পুস্তিকার জন্য অন্যান্য পুস্তকের ন্যায় বহুল প্রচার কামনা করি ও তার সফলতা কামনা করি।

খাদেম

ফেব্রুয়ারী ২০০৩ ঈসায়ী

(মুহাম্মাদ আহমাদুল্লাহ রহমানী নাসিরাবাদী)

মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবিয়া

উত্তর যাত্রাবাড়ী ঢাকা।

بسم الله الرحمن الرحيم

সূচনার কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌ তা'আলার। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। তাঁর নিকট সাহায্য চাচ্ছি ও প্রার্থনা করছি এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর উপর বর্ষিত হোক লক্ষ কোটি দরুদ ও সালাম।

পার্থিব জীবনের 'আমল একজন মুসলিমের জন্য নির্ধারণ করবে তার পরবর্তী জীবনের অবস্থান। অর্থাৎ জান্নাত অথবা জাহান্নাম। 'আমল সঠিক না হলে প্রাপ্তিও সুন্দর হবে না। আবার, একজন মুসলিমের 'আমল তার কোন কাজে আসবে না যদি তার ঈমান সঠিক ও মজবুত না হয়। ঈমান 'আমলকে এগিয়ে দেয়। আর সঠিক ঈমানদার ব্যক্তির 'আমল তার ঈমানকে বাড়িয়ে দেয় এবং আরো দৃঢ় করে। অর্থাৎ 'আমল এবং ঈমান পরস্পর পরিপূরক বিষয়। আমাদের ব্যক্তি জীবনে ইসলামকে বিশ্বাস করলেও কিছু কিছু মৌলিক বিষয়ে আমাদের খুবই সামান্য জ্ঞান থাকার কারণে কখনও কখনও কোন কোন ব্যাপারে আমাদের বিশ্বাস (ঈমান) এমন পর্যায়ে পৌছে যায় যে, তখন ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ঈমান আছে বলে সাব্যস্ত করা দুরূহ হয়ে পড়ে। অথচ ঈমান নষ্ট হয়ে গেলে 'আমলের কোন মূল্যই আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়াতা'আলার কাছে নেই।

ঈমান ও আক্বীদাহ হচ্ছে আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী যে কোন মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানুষের আমল, আখলাক, আচার-আচরণ তথা জীবনের সকল কর্মকাণ্ডের উপর ঈমান আক্বীদার রয়েছে বিরাট প্রভাব। তাই তার সততা, নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও আন্তরিকতা নিয়ন্ত্রিত হয় মূলত ঃ ঈমান ও আক্বীদার দ্বারা। একজন মু'মিন ব্যক্তির জন্য আক্বীদার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই তার আক্বীদাহ দিবালোকের মত স্বচ্ছ, সুস্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন ও নির্ভুল থাকা অপরিহার্য। কারণ শির্‌ক মিশ্রিত আক্বীদাহ একজন মু'মিনের যাবতীয় আমলকে নীরবে সন্তর্পনে ধ্বংস করে দেয়। একজন মানুষ মু'মিন অথবা কাফির হিসাবে বিবেচিত হওয়ার একমাত্র মানদন্ড হচ্ছে তার আক্বীদাহ।

দুঃখ জনক হলেও সত্য যে, বর্তমান সময়ে মুসলিমগণ সঠিক আক্বীদাহ্‌ হতে ক্রমশ ঃ দূরে সরে যাচ্ছে, যার পরিণতি মারাত্মক ভয়াবহ। এ অবস্থায় মুসলিমদের আক্বীদাহকে পরিশুদ্ধ করা অতীব প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তাই এই প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করেই আমার এই লেখার প্রয়াস।

পরিশেষে **"ঈমান ও সহীহ্‌ আক্বীদাহ, 'আল্লাহ কি নিরাকার ও সর্বত্র বিরাজমান "** নামক পুস্তক লিখতে গিয়ে যেসব জ্ঞানীদের গ্রন্থ থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে এবং আহলে হাদীস লাইব্রেরী ঢাকার বিশাল গ্রন্থভাণ্ডার ছাড়াও যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, আর এই বইয়ে কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে আমাদের জানালে ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে।

বিনীত

মুহাম্মাদ আইয়ূব

সূচী পত্র

প্রথম অধ্যায়

১। ঈমান ও আক্বীদাহ শব্দের অর্থ ৫
২। ঈমান ও আক্বীদাহ কাকে বলে ৫
৩। ঈমান ও আক্বীদাহর গুরুত্ব ৬
৪। ঈমান ও আক্বীদাহর মূল ভিত্তি ৭
৫। ঈমান ও আক্বীদাহর উৎস কি ৮
৬। ঈমানের ব্যাখ্যা ৮
৭। ঈমানের শাখা ১৭
৮। ঈমানের তাৎপর্য ও ঈমানদারের পরিচয় ১৮
৯। ঈমানের দাবী ত্বাগুত থেকে বেঁচে থাকা ২০
১০। ঈমানের আলামত ২১
১১। ঈমানের স্বাদ ২১

দ্বিতীয় অধ্যায়

১২। আল্লাহ শব্দের অর্থ ২২
১৩। আল্লাহ নামের বিকল্প শব্দ নেই ২২
১৪। আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ ২৩
১৫। আল্লাহ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করার সীমা ২৪
১৬। উপাস্য এক না একাধিক ২৪
১৭। আল্লাহ কি নিরাকার ? ২৫
১৮। আল্লাহ কি সর্বত্র বিরাজমান ? ২৮
১৯। তাওহীদ তিন প্রকার ৩২

তৃতীয় অধ্যায়

২০। সহীহ আক্বীদাহ্ সমূহ ৩৪

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম অধ্যায়

ঈমান ও আক্বীদাহ শব্দের অর্থ

ঈমান ঃ ঈমান শব্দের শাব্দিক অর্থ নিশ্চিন্ত করা ও নিরাপদ করা, বিশ্বাস করা ইত্যাদি (মিসবা-হুল লুগাত- ১৭ পৃষ্ঠা)

আক্বীদাহ ঃ আক্বীদাহ (عقيدة) একটি আরবী শব্দ এর শাব্দিক অর্থ বিশ্বাস। আরবী হলেও সকল ভাষাভাষী মুসলিমদের কাছে শব্দটি ব্যাপকভাবে পরিচিত।

মূলশব্দ 'আকদ' এর অর্থ থেকে বুঝা যায় আক্বীদাহ হচ্ছে দৃঢ় ও মজবুত বিশ্বাস। প্রতিশ্রুতি ও চুক্তি। মনের বদ্ধমূল ধারণাকে আরবীতে আক্বীদাহ বলা হয়।

ঈমান ও আক্বীদাহ কাকে বলে

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘোষণা অনুযায়ী সংক্ষেপে ছয়টি বিষয়ের উপরে বিশ্বাস রাখার নাম ঈমান। কোন ব্যক্তি যদি ইসলাম-প্রদর্শিত আল্লাহ ও মালাইকা (ফেরেশ্‌তা) আসমানী গ্রন্থ, নাবী ও রাসূল, পরকাল ও ভাগ্যের ভালমন্দের উপর বিশ্বাস করে সেই মত কাজ করতে পারে তাহলে ঐ বিশ্বাস ও কাজ তাকে আল্লাহ্‌র রাগ ও জাহান্নাম প্রভৃতি থেকে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ করতে পারে। এই জন্য ঐ ইসলামী-বিশ্বাসকে ঈমান বলা হয়। আর ঐ ঈমানকে মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে বা বদ্ধমূলভাবে গেঁথে রাখার নাম আক্বীদাহ। তবে যে কোন বিশ্বাস ও চুক্তিকেই আক্বীদাহ বলা হয় না। নির্দিষ্ট কোন ধর্ম, মতবাদ, আদর্শকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করাকেই 'আক্বীদাহ' বলা হয়। এ আক্বীদাহর সম্পর্ক মানুষের মনের সাথে; আর আক্বীদার প্রতিফলন ঘটে কর্মের মাধ্যমে। এই ঈমান ও আক্বীদাহ যখন ইসলাম ভিত্তিক হয় তখন মনের ঐ বিশ্বাসকে ইসলামী-ঈমান এবং ঐ বদ্ধমূল ধারণাটাকে ইসলামী আক্বীদাহ নামে অভিহিত করা হয়।

মুহাদ্দীস ইমাম আবূ বক্‌র মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন আল আ-জুরী (মৃত-৩৬০ হিঃ) তাঁর বর্ণনাসূত্র চতুর্থ খলীফা আলী (রাঃ) পর্যন্ত মিলিয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

অর্থাৎ ঈমান হচ্ছে জিহ্বা দিয়ে বলা এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে করা। আর অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা। (আশ্-শারীআহ-১৩১ পৃঃ)

আল্লাহ্-বিশ্বাসী একজন ঈমানদার ব্যক্তি ঈমান ও আক্বীদাহ মোতাবেক প্রত্যেকটি কাজ করতে বাধ্য। তাই ঈমান সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান সঞ্চয় করা প্রত্যেক মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য।

আর এই কারণেই সাহাবায়ে কিরাম আল কুরআন শিখবার আগে ঈমান শিক্ষা করতেন। (ইবনে মা-জা, ৭ম পৃষ্ঠা, ত্বাবনী কাবীর ২য় খণ্ড. ১৬৫ পৃষ্ঠা, আল্লামা তিরমিযীর তাহযীব ৭ম খণ্ড, ২৮৮ পৃষ্ঠা)

এই জন্যই সউদী আরবে ক্লাস ওয়ান থেকে এম, এ, পর্যন্ত প্রতিটি ক্লাসেই কোন না কোনভাবে আক্বীদাহর শিক্ষা অবশ্যই দেয়া হয়ে থাকে।

আল্লামা ইবনু রজব-শারহে আরবায়িন-গ্রন্থে বলেন, সালাফ ও হাদীস বিশারদ থেকে একথা প্রসিদ্ধ আছে যে, ঈমান হচ্ছে মুখে বলা ও করা এবং মন দিয়ে বিশ্বাস করা। আর সমস্ত কাজই ঈমান নামের অন্তর্গত। আর ইমাম শা-ফিঈ (রাহঃ) বলেন, এ বিষয়ে সাহাবায়েকিরাম এবং তাঁদের পরবর্তী তা-বিঈনে ইযামদেরও ইজ্‌মা তথা সর্বসম্মত রায় আছে। (আক্বীদাতুল মুসলিমীন ২য় খণ্ড, ৪৫০ পৃষ্ঠা।

এইজন্য আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনের সত্তরটি আয়াতে ঈমান ও আমলের কথা মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন। (ঐ, ৩৪ পৃষ্ঠা)

ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেন, ঈমান যখন বিনা কাজে শুধু কথায় হবে তখন তা কুফরী হবে। আর যখন তা কথায় ও কাজে হবে বিনা মননে (নিয়্যাতে) তখন তা মুনাফিকী হবে। আর যখন তা সুন্নাত মোতাবেক ছাড়া কথা ও কাজ এবং নিয়্যাত হবে তখন তা বিদ'আত তথা মনগড়া হবে (কিতাবুল ঈমান, ১৫২ পৃষ্ঠা)

[সূত্রঃ ঈমান ও আক্বীদা- অধ্যাপক মওলানা হাফিয শায়খ আইনুল বারী ভূমিকা-১৪-১৬ পৃষ্ঠা]।

ঈমান ও আক্বীদার গুরুত্ব

যে কোন কাজের ভিতরই হচ্ছে মনের বিশ্বাস। কোন বিষয়ের উপরে বিশ্বাস না জন্মালে তা করতে কোন মানুষই উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয় না। তেমনি ইসলাম নির্দেশিত সমস্ত কাজ কর্মেরই বুনিয়াদ ইসলাম-ঈমান ও আক্বীদাহর উপর প্রতিষ্ঠিত। এই জন্য ইসলামী-কাজ-কর্ম করার আগে ইসলামী-ঈমানের বিষয়টা জানা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য একান্ত ফরয বা অপরিহার্য কর্তব্য। এক যুবক সাহাবী জুন্দুব ইবনু আব্দুল্লাহ বলেন, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলাম। তখন আমরা নবযুবক ছিলাম। তাই আমরা কুরআন শিখার আগে ঈমান শিখতাম। তারপরে আমরা কুরআন শিখতাম। ফলে ওর কারণে আমাদের ঈমান বেড়ে যেতো (ইবনে মা-জাহ্ ৭ম পৃষ্ঠা)।

ঈমানের এই গুরুত্বের কারণেই আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে প্রায় সাতশত বিশ জায়গায় ঈমানের আলোচনা করেছেন (আক্বীদাতুল মুসলিমীন ১মখণ্ড, ২৯ পৃষ্ঠা)

সকল নাবী-রাসূলগণের দা'ওয়াতের মুল বিষয় ছিল আক্বীদাহ। প্রত্যেক নাবী-রাসূল নিজ নিজ জাতিকে সর্ব প্রথম খাঁটি নির্ভেজাল আক্বীদাহর দিকে দা'ওয়াত দিয়েছেন। আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর তেইশ বছর মেয়াদী রিসালাতের জীবনের মাক্কী অধ্যায়ের তের বছর শুধু আক্বীদার বিশুদ্ধতা ও

পরিচ্ছন্নতার দিকে দা'ওয়াত দিয়েছিলেন। যেহেতু 'ইবাদত ও আমলে আক্বীদাহ-বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটে, তাই আক্বীদাহ বিশুদ্ধ হলে 'ইবাদত ও আমলও বিশুদ্ধ হবে। আক্বীদায় বিকৃতি ঘটলে 'ইবাদত ও আমলে অবশ্যই তার প্রতিফলন ঘটবে।

মানুষের ধর্ম-কর্ম ও ব্যবহারিক জীবন পরিশুদ্ধ হওয়া নির্ভর করে তার 'আক্বীদাহ্র পরিশুদ্ধির উপর। যদি "আক্বীদাহ্ সহীহ্ হয় তাহলে 'আমলও সহীহ্ হবে। গলদ 'আক্বীদাহ্ সম্পন্ন ব্যক্তির 'আমল অর্থহীন, যেমন অর্থহীন হিন্দু, খৃষ্টান, ইয়াহুদ কিংবা অন্য কোনো বেদ্বীনের সলাত আদায় করায়। বাতিল 'আক্বীদাহ বিশ্বাসী মুসলিম ব্যক্তি কখনো কখনো কুফরীর দরজায় পৌঁছে যায়। তাই 'আক্বীদার গুরুত্ব এত অধিক যে, এরই ভিত্তিতে মানুষের যাবতীয় কাজ কারবার শুদ্ধ বা অশুদ্ধ হওয়া, জীবনের ব্যর্থতা বা সফলতা লাভ নির্ভরশীল।

সঠিক ও বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদাহ ছাড়া একজন মুসলিম ইসলাম বিরোধী ধ্যান-ধারণা থেকে বাঁচতে পারেনা। সে জন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- নাবী হবার পর মক্কা মুআয্যামায় সুদীর্ঘ তের বছর থাকাকালীন লোকদেরকে সলাত, যাকাত, সিয়াম (রোযা), হাজ্জ এবং জিহাদ প্রভৃতি করার আদেশ আর সুদ, ব্যাভিচার, মদ ও জুয়া ত্যাগ করার নির্দেশ দেবার আগেই আক্বীদাহ বিশুদ্ধ করার এবং মূর্তিপূজা ত্যাগ করার তাগিদ দিতে থাকেন (আল ইরশা-দ ইলা-সহীহিল ই'তিক্বা-দ ১৩ পৃষ্ঠা) [সূত্র ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সলাত এবং আক্বীদাহ ও যরুরী সহীহ্ মাসআলা- আবূ মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন নদীয়াভী-১৩ পৃঃ, ঈমান ও আক্বীদা অধ্যাপক মাওলানা হাফিয শাইখ আইনুল বারী আলিয়াভী-১০. ১১ পৃঃ)

ঈমান ও আক্বীদার মূল ভিত্তি

ইসলামী আক্বীদার মূল ভিত্তি দু'টি, ১. ঈমান বিল্লাহ- (আল্লাহর প্রতি ঈমান) ২. কুফ্‌র বিত্‌তাগূত- (ত্বাগূতকে অস্বীকার করা।)

১. ঈমান বিল্লাহ ঃ ঈমান বিল্লাহ মানে আল্লাহকে একমাত্র রব ও ইলাহ হিসেবে বিশ্বাস করা ও মানা। জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মানা। আল্লাহকেই শুধু আইন এবং শাসনের উৎস হিসাবে বিশ্বাস করা।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন ঃ

"إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ*

'আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান (দেয়ার ক্ষমতা) নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁর ছাড়া আর কারো 'ইবাদত করো না। এটাই সুদৃঢ় দ্বীন কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।' (সূরা ইউসুফ-৪০)

২. কুফ্‌র বিত্‌ত্বাগূত ঃ কুফ্‌র বিত্‌ত্বাগূত অর্থ ত্বাগূতকে অস্বীকার করা। আল্লাহ ছাড়া অন্য যাকেই মানা হয় সে-ই ত্বাগূত।

তাওহীদের দাবী হচ্ছে সকল প্রকার ত্বাগূতকে অস্বীকার করতে হবে। তাগূতকে অস্বীকার না করলে আল্লাহর প্রতি ঈমান নির্ভেজাল ও সুদৃঢ় হবে না। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহপাক এরশাদ করেছেনঃ

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَاانْفِصَامَ لَهَا*

'যে ত্বাগূত (আল্লাহ বিরোধী সব কিছুকে) অস্বীকার ও অমান্য করে আর আল্লাহর উপর ঈমান আনে, সে এমন এক সুদৃঢ় ও মজবুত অবলম্বনকে আঁকড়ে ধরে, যা ভাঙ্গবার নয়।' (সূরাঃ বাকারা-২৫১)

ইসলামের মূল ভিত্তি আক্বীদাহ। আক্বীদাহর সম্পর্ক ঈমানের সাথে। আক্বীদাহ সহীহ ও সঠিক হলে 'ইবাদত ও আমল সঠিক হবে। আক্বীদাহ্ নিখুঁত ও খাঁটি না হলে 'ইবাদত ও আমল সঠিক হবে না।

ঈমান ও আক্বীদার উৎস কি

আক্বীদাহর মূল উৎস হচ্ছে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ। আক্বীদাহর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহ শুধুমাত্র কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ দ্বারা যে সব বিষয় প্রমাণিত সেগুলো বিশ্বাস করতে হবে। যে সব বিশ্বাসের পক্ষে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর সমর্থন নেই তা আক্বীদাহ বিষয় হতে পারেনা। আক্বীদাহ ও 'ইবাদতে ইজতিহাদের সুযোগ নেই।

আক্বীদাহ ও 'ইবাদতের সকল বিষয়ই কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ নির্ভর। দুর্বল হাদীস, ইজতিহাদ বা কারো মতের ভিত্তিতে কোন বিষয়কে আক্বীদার বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।

ঈমানের ব্যাখ্যা

✪ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ঃ "আল্লাহ (এইরূপ যে) তিনি ভিন্ন কেহ 'ইবাদতের প্রকৃত যোগ্য নহে; তিনি চিরস্থায়ী। না তন্দ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে, আর না নিদ্রা। তাঁরই সত্বাধীনে রয়েছে যা কিছু আসমান এবং যমিনে আছে। এমন ব্যক্তি কে আছে? যে তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে তাঁর অনুমতি ব্যাতিত তিনি অবগত আছেন তাদের (সৃষ্টির) উপস্থিত ও অনুপস্থিত অবস্থাবলী। আর ঐ সমূদয় সৃষ্টি তাঁর ইল্‌মের কোন বস্তুকেই স্বীয় জ্ঞানের আবেষ্টনীতে আনতে পারে না। তবে যে পরিমাণ তিনি শিক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা করেন। তাঁর কুরসী আসমান সমূহ ও যমিনকে নিজের মধ্যে ধারণ করে রেখেছে আর আল্লাহ্‌র পক্ষে এতদুভয়ের হিফাযত কিছুমাত্র কষ্টকর হয় না। এবং তিনি অতি উচ্চ মর্যাদাশালী, অতি মহান। (সূরা বাকারাহ-২৫৫)

"তিনি আল্লাহ্ এমন মা'বুদ যে, তিনি ছাড়া আর কোন সত্য মা'বূদ নাই। তিনি অদৃশ্য প্রকাশ্য বস্তুসমূহের সব কিছু জানেন, তিনি বড় মেহেরবান, পরম দয়ালু। তিনি এমন মা'বুদ যে, তিনি ছাড়া আর কোন সত্য মা'বুদ নাই। তিনি বাদশাহ্ পবিত্র (সমস্ত কলঙ্ক হতে), নিরাপত্তা প্রদানকারী, রক্ষাকর্তা, মহাপরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, সুমহান; আল্লাহ্ তা'য়ালা মানুষের অংশীবাদ হতে পবিত্র। তিনি মা'বুদ, সৃষ্টিকারী, উদ্ভাবক, আকৃতি নির্মাণকারী, তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করেছে-যা আসমান সমূহ ও যমীনে রয়েছে আর তিনি মহাপরাক্রান্ত । (সূরা-হাশর-২২, ২৩, ২৪ পৃঃ)

"তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যাসমূহ দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্রসমূহ দান করেন, অথবা তাদেরকে পুত্র ও কন্যা উভয়ই মিশ্রিত করে দেন এবং যাকে ইচ্ছা নিঃসন্তান রাখেন; নিঃসন্দেহে তিনি সর্বজ্ঞতা, মহাশক্তিমান। (সূরা আশ্ শূরা-৪৯, ৫০)

"কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নাই, আর তিনিই সর্ব বিষয় শ্রবনকারী. দর্শনকারী। আসমান সমূহ ও যমিনের চাবিগুলি তাঁরই আয়ত্বে রয়েছে, যাকে ইচ্ছা প্রচুর জীবিকা দেন, আর (যাকে ইচ্ছা) কম করে দেন; নিঃসন্দেহে তিনি সর্ব বিষয়ে পূর্ণজ্ঞাত।"

(সূরা আন'আম-৫৯)

"আর ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী কোন প্রাণী এমন নাই যে, তার রিয্‌ক আল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত নয় আর তিনি জানেন যে, কোথায় তার সর্বশেষ অবস্থান এবং কোথায় তাকে রাখা হবে; সমস্তই সুস্পষ্ট কিতাব (লওহে মাহ্‌ফুজে) রয়েছে। (সূরা হুদ-৬)

" আর আল্লাহ্‌রই নিকট আছে সমস্ত গুপ্ত বস্তুর ভাণ্ডার, আল্লাহ্ ভিন্ন অপর কেউ অবগত নয়; এবং তাঁর জ্ঞাতসার ব্যতিত কোন পাতা ঝরে না, আর কোন বীজ যমীনের অন্ধকার অংশে পতিত হয় না এবং কোন আদ্র এবং শুষ্ক বস্তুও পতিত হয় না ; কিন্তু এই সমস্তই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। (সূরা আন'আম-৫৯)

"নিঃসন্দেহে ক্বিয়ামাতের সংবাদ আল্লাহ্ তায়ালারই রয়েছে এবং তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করে থাকেন এবং তিনিই অবগত আছেন যা গর্ভাধারে রয়েছে; এবং কেউই জানেনা যে, সে আগামীকাল কি অর্জন করবে; কেউই জানেনা যে, সে কোন স্থানে মরবে; নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তায়ালাই (সেই) সমস্ত বিষয়ে অবগত ও অবহিত আছেন।

(সূরা ঃ লুক্বমান-৩৪)

"আপনি বলে দিন, যদি আমার রব্বের বাণীসমূহ লিখার জন্য সমুদ্র (এর পানি) কালি হয়, তবে আমার রব্বের বাণীসমূহ পরিসমাপ্তির পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষিত হয়ে যাবে, যদি ও ঐ সমূদ্রের অনুরূপ আরও সমুদ্রকে তার সাহাযার্থে আনয়ন করি।"

(সূরা কাহাফ-১০৯

"কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নাই, আর তিনিই সর্ব বিষয় শ্রবণকারী, দর্শনকারী। আল্লাহ্ তায়ালার ইচ্ছা দুই প্রকার (১) ইরাদা কাউনিয়্যাহ (২) ইরাদা শারইয়্যাহ।

ইরাদা কাউনিয়্যাহ অর্থ ঃ এইরূপ ইরাদা দ্বারা আল্লাহ্র ইচ্ছা সম্পাদন হয়ে থাকে; কিন্তু তাই বলে এটা তাঁর পছন্দীয় হওয়া জরুরী নয়। আর এইরূপ ইরাদার অর্থ " আল-মাশিয়াহ" বা ইচ্ছা পোষণ করা। যেমন আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন ঃ

"আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তবে তারা পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহ করত না; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন তাই করেন। (সূরা বাকারা-২৫৩)

'আর আমার মঙ্গল কামনা (নসীহত) করা তোমাদের কাজে আসতে পারে না, আমি তোমাদের যতই মঙ্গল কামনা করতে চাই না কেন যখন আল্লাহ্রই তোমাদিগকে পথপ্রষ্ট করার ইচ্ছা হয়; তিনিই তোমাদের প্রতিপালক।" (সূরা হুদ-৩৪)

ইরাদা শারইয়্যাহ অর্থ ঃ এইরূপ ইচ্ছাকৃত বিষয় সংঘটিত হওয়া জরুরী হয় না, তবে এইরূপ ইচ্ছা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার পছন্দনীয় বিষয়ই সংঘঠিত হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

"আর আল্লাহ তো তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হতে চান।" (সূরা আন নিসা-২৭)

আল্লাহ্ তা'আলার ইরাদাতুন কাউনিয়্যাহ বা কাউনীয়্যাহ বা কাউনী ইচ্ছা ও ইরাদাতুন শারইয়্যাহ বা শারঈ ইচ্ছা উভয়টিই তাঁর হিকমাত অনুযায়ী। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলা যত কিছুই তাঁর কাউনী ইচ্ছা অথবা শারঈ ইচ্ছা প্রসূত ফায়সালা করেছেন এতে নিশ্চয়ই কোন না কোন হিকমাত রয়েছে তা আমরা জানতে পারি আর নাই পারি। সব কিছুকে তিনি (আল্লাহ) স্বীয় ইল্ম (জ্ঞান) দ্বারা ঘিরে রেখেছেন এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টিতেই রেখেছেন, সুতরাং তিনি তাঁর বান্দার কোন কাজ কর্ম হতে মোটেই উদাসীন নন। তাঁর পূর্ণ জ্ঞান ও অসীম ক্ষমতা থাকার ফলে পৃথিবী ও আসমান সমূহের কোন কিছুই তাকে অক্ষম করতে পারে না। "তিনি (আল্লাহ) কোন কিছু সৃষ্টি করতে চাইলে তাঁর নিয়ম হল তিনি বলেন, হয়ে যা, আর হয়ে যায়। তাঁর (আল্লাহ) পূর্ণ শক্তি আছে বিধায় অক্ষমতা ও দুর্বলতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। "আর আমি আসমান সমূহ ও জমীনকে এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সমস্ত বস্তুকে ছয়দিনে সৃষ্টি করেছি, অথচ ক্লান্তি আমাকে স্পর্শও করেনি।" (সূরা ক্বাফ-৩৮)

(لُغُوْبٌ) লুগূবঃ অর্থ ক্লান্তি, অক্ষমতা ও অপরাগতা। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা নিজের জন্য যে সব উত্তম ও গুণাবলী পছন্দ করে নিদিষ্ট করেছেন এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর (আল্লাহর) জন্য নির্দিষ্ট করেছেন তাতে বড় ধরনের দুইটি বর্জনীয় বিষয় হল ঃ

اَلتَّمْثِيْلُ ঃ আল্লাহ্র সাথে অন্য কিছুর উদাহরণ নির্ণয় করা বা আল্লাহকে কোন কিছুর অনুরূপ মনে করা অর্থাৎ অন্তরে বা মুখে বলা যে-আল্লাহ তা'আলা গুনাবলী সমূহ তাঁর সৃষ্টি কুলের গুণাবলীর মতই।

اَلتَّكْيِيْفُ ঃ রকম নির্ণয় করা। অর্থাৎ মুখে বা অন্তরে বলা যে, আল্লাহর গুণাবলী এই রকম ঐ রকম।

যে, সকল বিষয় আপন সত্ত্বা হতে নিষেধ করেছেন অথবা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সত্ত্বা হতে বাদ দিয়েছেন তা আল্লাহ্র জন্য নহে। আর এইরূপ নিষেধ উক্তি তাঁর বিপরীত বিষয়টির পরিপূর্ণতাকে আবশ্যিক করে তোলে। পাশাপাশি- আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল বিষয়ের বর্ণনা হতে বিরত থেকেছেন উহার আলোচনা হতে আমরাও বিরত থাকব।

«اٰمَنَّا بِهٖ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا»

সবই আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে সমাগত।" (সূরা আল-ইমরান-৭)

ঐ সন্দেহ পোষণকারী যেন এই কথাও ভালরূপে জেনে রাখে যে, আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ এর কোনটির মধ্যেই বৈপরীত্য নাই, তা ছাড়াও এতদুভয়ের মধ্যে পরস্পর কোন বৈসাদৃশ্যও নাই।

সংক্ষিপ্ত হচ্ছে ঃ অর্থাৎ আল্লাহ্'র উপর ঈমান আনার অর্থ হলো আবহমান কাল থেকে তাঁকে বিদ্যমান বলে স্বীকার করা, সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা এবং একক ও নিরংকুশ ব্যবস্থাপক হিসাবে তাঁকে মেনে নেয়া। অকপট চিত্তে এটা স্বীকার করে নেয়া যে, বিশ্ব সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনায় আল্লাহ্'র সমকক্ষ নেই। তিনি সকল প্রকার দোষত্রুটি মুক্ত। যাবতীয় গুণ, বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্যের তিনিই একচ্ছত্র মালিক।

✪ মালাইকাদের (ফেরেশতাদের) প্রতি বিশ্বাস ঃ "বরং (তাঁরা ফেরেশতাগণ) সম্মানিত বান্দা, তারা আল্লাহর আগে বেড়ে কথা বলতে পারে না এবং তাঁরই আদেশ অনুযায়ী কাজ করে থাকে।" (সূরা আম্বিয়া-২৭)

যেহেতু আল্লাহ তা'য়ালাই তাদের সৃষ্টি করেছেন, সেহেতু তারা আল্লাহরই ই'বাদত করছে এবং তাঁরই আনুগত্য মেনে নিয়েছে।

আর যারা (ফেরেশতারা) তাঁর (আল্লাহ্র) সান্নিধ্যে আছে তারা তাঁর ই'বাদতে অহংকার করে না, এবং অলসতাও করে না এবং রাত দিন তাঁরই তসবীহ্ করতে ব্যস্ত থাকে; একবিন্দুও থামে না। (সূরা আম্বিয়া-১৯, ২০)

আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে (ফেরেশতাদেরকে) আমাদের নিকট হতে আড়াল করে রেখেছেন; ফলে আমরা তাদেরকে দেখতে পাই না।

* হযরত জিব্রাঈল (আঃ) ওয়াহী বহনের দায়িত্বে রয়েছেন। তিনি আল্লাহর নিকট হতে ওয়াহী নিয়ে তাঁর (আল্লাহ) ইচ্ছা অনুযায়ী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর অবতীর্ণ হন।

* হযরত মীকাঈল আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টি ও উদ্ভিদ বিষয়ক দায়িত্বে রয়েছেন।

* হযরত ইস্রাফীল আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই জগতের প্রলয় আনবেন ও পুরুত্থানের দিন (আল্লাহ্র আদেশে) শিংগায় ফুৎকার দিবার দায়িত্বে রয়েছেন।

* মালাকুলমউত (ফেরেশতা) সকল জীবনের মৃত্যুর সময় তার রূহ ক্বব্জ করবার দায়িত্বে নিয়োজিত।

* মালাকুল জেবাল, পাহাড়-পবর্ত নিয়ন্তনের দায়িত্বে রয়েছেন।

* মালিক মালাইক (ফেরেশতা) জাহান্নামের দায়িত্বে নিয়োজিত।

তা ছাড়াও বহু সংখ্যক মালাইকা (ফেরেশতা) মায়ের জরায়ুতে ভ্রূণ স্থাপনের দায়িত্বে রয়েছেন।

* আরো বহু মালাইকা রয়েছেন আদম সন্তানদিগকে হিফাজতের জন্য আরো কিছু মালাইকা রয়েছে মানুষের আমলনামা (প্রতিদিনের কার্যকলাপ) লিপিবদ্ধ করার দায়িত্বে। এই পর্যায়ে প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে দুই জন করে মালাইকা (কিরামান কাতেবীন) রয়েছে।

১। আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, এক সহীহ্ হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "মালাইকাগণ নূরের সৃষ্টি, জিনেরা আগুন থেকে সৃষ্টি এবং আদমকে যা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পবিত্র কুরআনে বলে দিয়েছেন।" (মুসলিম)

২। আল্লাহ্র মালাইকাগণ (ফেরেশতাগণ) আরও অনেক প্রকার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন। তন্মধ্যে একদল তাঁর আরশ উত্তোলনের কাজে, অপর একদল জান্নাত ও জাহান্নামের তত্ত্বাবধানে এবং আরেক দল মানুষের 'আমলনামা সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন।

সংক্ষিপ্ত হচ্ছে ঃ অর্থাৎ তাদের অস্তিত্বকে মেনে নিয়ে একথা বিশ্বাস করতে হবে যে, তারা আল্লাহ্'র পবিত্র সৃষ্টি। তারা সদা সর্বদা আল্লাহ্'র আনুগত্য করছে এবং কোন সময়ই তাঁর অবাধ্যতা বা নাফরমানী করছে না। অনুগত দাসের ন্যায় আল্লাহ্'র প্রতিটি হুকুম পালনের জন্য তারা প্রস্তুত হয়ে থাকে এবং সৎ কাজের নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ্'র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে।

✪ কিতাব সমূহের প্রতি বিশ্বাস ঃ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আপন সত্যের ঘোষণা এবং এর প্রতি আহ্বান জানানোর উদ্দেশ্যে তাঁর নাবী ও রাসূলগণের উপর বহু সংখ্যক কিতাব অবতীর্ণ করেছেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ *

অর্থাৎ (নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায় নীতি, যাতে মানুষ সুবিচার-প্রতিষ্ঠা করে।

(সূরা হাদীদ-২৫)

আর বিশদভাবে আমরা ঐ সব কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব যেগুলির নাম আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। যেমন, তাওরাত, ইঞ্জিল, যবুর ও কুরআন। এগুলির মধ্যে কুরআনই সর্বোত্তম ও সর্বশেষ কিতাব, যা পূর্ববর্তী অপর কিতাব সমূহের সংরক্ষক ও সত্যায়নকারী। সমগ্র উম্মতকেই এর অনুসরণ করতে হবে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত সহীহ্ সুন্নাহ্সহ এরই মীমাংসা মেনে নিতে হবে। কেননা, আল্লাহপাক তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্র জিন ও ইনসানের প্রতি রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর প্রতি এই মহান কিতাব কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, যাতে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দ্বারা লোকদের মধ্যে মীমাংসা করান। উপরুন্ত আল্লাহ্ তা'আলার এই কুরআনকে তাদের যাবতীয় ব্যাধির প্রতিকার, তাদের প্রতিটি বিষয়ের স্পষ্ট প্রতিপাদক এবং ঈমানদারদের জন্য হিদায়াত ও রাহমাত স্বরূপ অবতীর্ণ করেছেন।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেনঃ অর্থাৎ (আর আমি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছি যা বারকাতময় ও কল্যাণময়! সুতরাং, তোমরা এর অনুসরণ করে চল এবং এর বিরোধীতা হতে বেঁচে থাক, হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হবে) (সূরা আন'আম-১৫৫)

অর্থাৎ আমি আত্মসর্ম্পণকারী (মুসলিমদের) জন্য প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ, পথ নির্দেশনা ও সুসংবাদ স্বরূপ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি।

(সূরা নাহ্ল - ৮৯)

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ অর্থাৎ বল, হে মানব মণ্ডলী! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহ্র রাসূল হিসাবে প্রেরিত হয়েছি, যিনি আকাশ ও ভূ- মণ্ডলের সার্বভৌম একচ্ছত্র মালিক। তিনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই। তিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। সুতরাং, আল্লাহ্র প্রতি এবং তাঁর সেই বার্তাবাহক নিরক্ষর নাবীর প্রতি ঈমান আনয়ন কর। যে আল্লাহ্ ও তাঁর পবিত্র কালিমা বিশ্বাস স্থাপন করে, তোমরা তাঁরই অনুসরণ কর। আশা করা যায়, তোমরা সরল সঠিক পথের সন্ধান পাবে। (সূরা আ'রাফ-১৫৮)

সংক্ষিপ্ত হচ্ছে ঃ অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁর নাবী রাসূলগণের মাধ্যমে যুগে যুগে সে সমস্ত বিধি-বিধান দুনিয়াবাসীর হিদায়াতের জন্য পাঠিয়েছেন তার সবগুলোকে সত্য বলে স্বীকার করা। কিতাবগুলোর মধ্যে সর্বশেষ কিতাব হচ্ছে আল-কুরআন। পূর্ববর্তী জাতিসমূহ তাদের উপর প্রদত্ত কিতাবসমূহ বিকৃত করে ফেলায় আল্লাহ তাঁর সর্বশেষ রাসূলের মাধ্যমে 'আসমানী কিতাব আল-কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। এ কিতাবের

বক্তব্য অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও স্পষ্ট এবং যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি ও বিকৃতির উর্দ্ধে। আল্লাহ্'র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে এ কিতাব ব্যতীত অন্য কোন কিতাবই আজ মানবজাতির হাতে নেই।

✪ রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস ঃ আল্লাহ তায়ালা তার সৃষ্টি জগতের প্রতি স্বীয় রাসূলকে (জান্নাতের) সুসংবাদ দাতা ও (জাহান্নামের আযাবের) ভীতিপ্রদর্শনকারী হিসাবে পাঠিয়েছেন।

"তাদেরকে সুসংবাদ প্রদানকারী এবং ভয় প্রদর্শনকারী নাবী করে এই জন্য প্রেরণ করেছেন, যেন এই পয়গম্বরদের পর আল্লাহর সম্মুখে মানুষের নিকট কোন যুক্তি (বাহ্যিক দৃষ্টিতেও) না থাকে। আর আল্লাহঃ পূর্ণ ক্ষমতাবান, বড়ই প্রজ্ঞাময়।"
(সূরা আন-নিসা-১৬৫)

মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর আর কোনই নবী রাসূল নাই। এটা জানা সত্বেও যে ব্যক্তি নিজেকে নাবী বলে দাবী করবে, অথবা কেউ তার সেই দাবীকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে সে অবশ্যই কাফির। কেননা এই উভয় শ্রেণীই মহান আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলিম সম্প্রদায়ের 'ইজমাকে' (সর্ব সম্মিলিত মত) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।

সকল নাবী ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনা, তাদের কিছু সংখ্যকের কথা কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে এবং অধিকাংশের নামও উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু, তাদের মধ্যে কোনরূপ তারতম্য না করে বিনা দ্বিধায় সকল নাবী ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনা এবং তাদের প্রতি নাযিলকৃত আহ্কাম তাদের উম্মাতের প্রতি সঠিকভাবে পৌছে দিয়েছেন- এ সবের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা এই উম্মাতের জন্য জরুরী। নাবী ও রাসূলগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল, আখিরী নাবী, খাতামুন নাবিইয়ীন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

সংক্ষিপ্ত হচ্ছে ঃ অথ্যাৎ আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে মানবজাতির হিদায়াতের জন্য যত নাবী ও রাসূল এ দুনিয়ায় এসেছেন তাঁরা সবাই সত্য। তাঁরা আল্লাহ্'র নির্দেশ ও বাণী সমূহ পরিবর্তন ও পরিবর্ধণ ব্যতীত হুবহু মানুষের নিকট পৌছে দিয়েছেন। আল্লাহ্'র প্রেরিত রাসূলগণের মধ্যে সর্বশেষ রাসূল হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বর্তমান দুনিয়ায় তাঁর প্রদর্শিত পন্থার অনুসরণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানবজাতির মুক্তির একমাত্র উপায়।

✪ ক্বিয়ামাতের প্রতি বিশ্বাসঃ এতে আমরা সর্বশেষ দিবস (ক্বিয়ামাত) এর ঈমান রাখি যে, ঐ দিনের পর আর কোনই দিন নাই। (ক্বিয়ামাতের দিন) সে দিন যে দিন মানব জাতিকে চির সুখ-সম্ভোগের স্থান জান্নাত অথবা চিরকঠিন যন্ত্রনাদায়ক মহাশাস্তির স্থান জাহান্নামে নির্ধারিত হবার জন্য জীবিত অবস্থায় (ক্বরর হতে) উঠানো হবে। সুতরাং আমরা মৃত্যুর পর পুরুত্থানের বিশ্বাসী। পুনরুত্থান হল ঃ আল্লাহ তা'য়ালার আদেশে হযরত ইস্রাফীল (আঃ) দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁক দিবেন, এবং

আল্লাহ তায়ালা সকল মৃতপ্রাণীকে পুনর্জীবিত করবেন।

"আর (ক্বিয়ামাতের দিবসে) শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, তখন আসমান সমূহ ও যমীনের অধিবাসীগণ হতজ্ঞান হয়ে পড়বে; কিন্তু আল্লাহ যাকে চাহেন (সে তা থেকে রক্ষা পাবে), অতঃপর এতে দ্বিতীয়বার ফুৎকার দেয়া হবে তৎক্ষনাৎ সকলে দাঁড়িয়ে যাবে এবং (চতুর্দিকে) দেখতে থাকবে। হাদীসে আছে যে, সেই দিন মানুষেরা তাদের ক্বর হতে উলঙ্গ অবস্থায় উঠে আসবে। (সূরা ঃ আয-যুমার-৬৮)

সংক্ষিপ্ত হচ্ছে ঃ অথ্যাৎ একথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করা- এমন একদিন আসবে যেদিন মানুষের জীবনের প্রতিটি কাজ-কর্মের হিসাব-নিকাশ নিয়ে ভাল কাজের জন্য সীমাহীন পুরস্কার ও মন্দ কাজের জন্য উপযুক্ত শাস্তি দেয়া হবে।

✪ তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাসঃ আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন আসমান, যমীন সৃষ্টিকরার পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সমস্ত মাখলুক্বের অদৃষ্টলিপি লিখে দিয়েছেন, যা লওহে মাহ্ফুজে সংরক্ষিত আছে, যার কোনো পরিবর্তন নেই। এর নাম তাক্বদীর। তাক্বদীরের প্রতি ঈমান বলতে বুঝায় নিম্নোক্ত চারটি বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা।

প্রথমত ঃ এই বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে, অতীতে যা কিছু ছিল এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতে যা কিছু হচ্ছে কিংবা হবে তার সবকিছুই আল্লাহ্র জানা আছে। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে অবহিত। তাদের রিয্ক , মত্যুর নির্ধারিত সময়. দৈনন্দিন কার্যাবলীসহ অন্যান্য সব বিষয়াদি সম্পর্কে তিনিই অবগত, কোন কিছুই তাঁর অগোচরে নেই। তিনি পুতঃ পবিত্র, মহান।

এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেনঃ অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার রিয্ক বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তা সীমিত করেন। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত। (সূরা আনকাবুত-৬২)

অন্যত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আরও বলেন ঃ অর্থাৎ যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং জ্ঞানে আল্লাহ্ সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন। (সূরা তালাক-১২)

দ্বিতীয়ত ঃ এই বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যা কিছু নির্ধারণ ও সম্পাদন করেন সব কিছুই তাঁর কাছে লিখা ও জানা রয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ অর্থাৎ (পৃথিবী ওদের দেহ থেকে যা কিছু গ্রহণ করে তা আমার জানা আছে এবং আমার নিকট একটি সংরক্ষক কিতাব রয়েছে)। (সূরা কাফ্-৪)

অন্যত্র আল্লাহ বলেনঃ "আমি প্রতিটি বস্তু একটি স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি।" (সূরা ইয়াসীন-১২)

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ "তোমাদের কি জানা নেই যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সবকিছুই আল্লাহ্ তা'আলা অবগত আছেন ? নিশ্চয়ই এ সবই লিপিবদ্ধ রয়েছে এক কিতাবে; এটা আল্লাহর নিকট অতি সহজ)।" (সূরা হাজ্জ-৭০)

তৃতীয় ঃ আল্লাহ্ তা'আলার কার্যকারী ইচ্ছার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই হয় এবং যা ইচ্ছা করেননা তা হয় না। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেনঃ "আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তাই করেন।" (সূরা হজ্জ-১৮)

আল্লাহ আরও বলেন ঃ "বস্তুতঃ তাঁর ব্যাপার শুধু এই যে, যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন বলেনঃ হও, ফলে তা হয়ে যায়।" (সূরা ইয়াসীন-৮২)

অন্যত্র আল্লাহ বলেন ঃ

অর্থাৎ আর আসলে তোমাদের চাওয়ায় কিছুই হয় না, যতক্ষণ না আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন চান। (সূরা তাকউইর-২৯)

চতুর্থ ঃ এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, সমগ্র বস্তুজগত আল্লাহ্পাকের সৃষ্টি। তিনি ব্যতীত না আছে কোন স্রষ্টা, আর না আছে কোন রব প্রতিপালক। আল্লাহ্ এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ অর্থাৎ আল্লাহ্ প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সব কিছুর কর্মবিধায়ক। (সূরা যমার-৬২)

সংক্ষিপ্ত হচ্ছে ঃ অর্থাৎ একথা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করা- এ পৃথিবীতে যা কিছু হচ্ছে সবই আল্লাহ্'র হুকুমে হচ্ছে। এখানে শুধু তাঁর হুকুমই চলে অন্য কারো হুকুম চলেনা। এমন নয় যে, তাঁর ইচ্ছার বিপরীতে কোন কিছু ঘটে। তিনি প্রথম থেকেই ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ ও সততা- ভ্রষ্টতার একটি বিধান তৈরী করে দিয়েছেন। আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দার উপর যে বিপদ পতিত হয়, যে মারাত্মক সমস্যা তার উপর আপতিত হয় এবং সে যে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, তার সব কিছুই প্রভূর হুকুমের পূর্ব নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ীই ঘটে থাকে।

[সূত্র ঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আক্বীদাহ বা বিশ্বাস শায়খ মুহাম্মাদ সালেহ আল উসাইমীন, সঠিক আক্বীদা ও উহার পরিপন্থী বিষয়-শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সালাত এবং আক্বীদাহ্ ও যরুরী সহীহ মাস আলাহ্- আবূ মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন নদীয়াভী]

ঈমানের শাখা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ অর্থাৎ (ঈমানের সত্তরটিরও বেশী শাখা আছে। তার মধ্যে সর্বোত্তম হল কালিমা লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ্ বলা। সর্বনিম্ন হল রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিষ সরান এবং লজ্জা ঈমানের একটি শাখা)। (বুখারী মুসলিম)

ইব্ন হাজার আসকালানী (রহঃ) ফতহুল বারীতে বলেন ঃ ইব্ন হিব্বান যা বলেছেন তার সারমর্ম হল- এই বিভাগগুলোর শ্রেণী বিভাগ মানুষের অন্তরের আমল, জিহ্বার কাজ এবং শারীরিক কাজ।

✪ অন্তরের কাজ হল বিশ্বাস ও নিয়্যাত ঃ এর ২৪ টি ভাগ। আল্লাহর উপর ঈমান, এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হল তাঁর জাতের উপর এবং সিফাতের উপর এবং

তাওহীদের উপর ঈমান। কারণ আল্লাহ বলেন ঃ

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ*

অর্থাৎ (তাঁর মত কেউ নেই। কিন্তু তিনি সব শোনেন ও সব দেখেন)

(সূরা শূরা- ১১)

তিনি ছাড়া অন্য যা কিছু আছে তাদেরকে তৈরী করা হয়েছে এবং 'ইবাদাত অন্যের জন্য না করা। যেমন দু'আ, সাহায্য অথবা এ জাতীয় অন্যান্য কাজ, মালাইকাদের (ফেরেশতাদের) উপর ঈমান, তাঁর কিতাবের উপর, রাসূলদের উপর, ক্বদরের উপর, ভাল ও মন্দের উপর ও আখিরাতের উপর ঈমান আনা। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হল ক্বরের সওয়াল, ক্বিয়ামাত এবং ক্বর থেকে উঠান, হিসাব নিকাশ, মীযান, পুলসিরাত, জান্নাত ও জাহান্নামের আগুন। আল্লাহর সাথে মহব্বত, ভালবাসা এবং শত্রুতা তাঁর কারণেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মহব্বত এবং তাঁর সম্মান করার ধারণা করা। তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হল তাঁর উপর দরূদ পড়া এবং তাঁর সুন্নাতের অনুসরণ করা এবং ইখলাস। তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হল তাঁর উপর দরূদ পড়া এবং তাঁর সুন্নাতের অনুসরণ করা এবং ইখলাস। তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হল রিয়া ও নিফাককে ত্যাগ করা। তওবাহ করা, ভয় করা, আশা করা, শুকরিয়া আদায় করা, সততা, সবর, আল্লাহর বিচারে রাজী থাকা এবং তাওয়াক্কুল, রাহমাত বিনয়-নম্রতা। এর মধ্যে প্রবেশ করে বড়দের প্রতি সম্মান, ছোটদের প্রতি ভালবাসা এবং অহংকার আত্মগর্ব হিংসা বিদ্বেষ এবং রাগ ত্যাগ করা।

✪ জিহ্বার আমল ঃ এর মধ্যে সাতটা ভাগ অন্তর্ভুক্ত। কালিমা শাহাদাত পড়া, কুরআন তিলাওয়াত করা, ইলম শিক্ষা করা এবং অন্যকে শিক্ষাদেয়া। দু'আ, যিকির, তার মধ্যে আছে ইস্তিগফার করা এবং খারাপ কথা থেকে বিরত থাকা।

✪ শরীরের আমল ঃ এর মধ্যে ৩৮টা ভাগ আছে।

(ক) এর মধ্যে কতকগুলো চোখের সাথে জড়িত সেগুলি ১৫টি। এর মধ্যে আছে পবিত্রতা। এর মধ্যে আছে অন্যকে খাবার খাওয়ান এবং মেহমানদের সম্মান, নফল ও ফরয। ইতিক্বাফ করা, লাইলাতুল ক্বাদর খোঁজা, হাজ্জ ও ওমরাহ করা, তাওয়াফও সেই রকম। দ্বীনকে জিন্দা রাখার জন্য অন্যত্র হিজরত করা, তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত শিরকের দেশ থেকে হিজরত করা। সৎ কাজের মানত পূর্ণ করা, কসম পূর্ণ করা, এর মধ্যে সত্যিকার ভাবে আল্লাহর নামেই কসম খাওয়া, কাফ্ফারা আদায় করা- যেমন প্রতিজ্ঞা পালনের, রামাযান মাসে দিনের বেলা সহবাসের ইত্যাদি।

(খ) এর মধ্যে যা অনুসরণের সাথে জড়িত। সেগুলি হল ছয়টি। বিবাহের দ্বারা নিজের ইজ্জত রক্ষা করা এবং পরিবারের হাক্ব আদায় করা, বাবা মায়ের খিদমাত করা। এর মধ্যে তাদের কষ্ট না দেয়া এবং বাচ্চাদের ইসলামী মতে প্রতিপালন করা। আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক রাখা, নেতাদের মান্য করা-(পাপের কাজ ছাড়া)

অধিনস্তদের সাথে সদয় ব্যবহার করা।

(গ) অন্য কতকগুলো যা সাধারণতভাবে সকলের সাথে জড়িত ঃ এর মধ্যে ১৭টা ভাগ আছে ন্যায় বিচারের সাথে আমীরের দায়িত্ব পালন করা, মুসলিমদের দলের সাথে থাকা, হাকিমদের (রাজাদের) কথা মান্য করা, (যদি কোন পাপের হুকুম না দেয়)। মানুষের মধ্যে মিলমিশ ঘটান, তার মধ্যে খারেজীদের সাথে যুদ্ধ করা, বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ করা, নেক কাজে ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করা। এর মধ্যে সৎকাজের প্রতি আদেশ ও অন্যায় হতে বিরত হওয়া অন্তর্ভুক্ত। হাজ্জ কায়িম করা, জিহাদ করা, তার মধ্যে যুদ্ধের জন্য তৈরী হওয়া এবং আমানত আদায় করা, তার মধ্যে গণিমতের $\frac{১}{৫}$ বাইতুল মালে দেয়া। করজ আদায় করা, প্রতিবেশীকে সম্মান করা, ব্যবসা বাণিজ্য ভালভাবে করা, তার মধ্যে হালাল উপায়ে মাল কামাই করা এবং হক্ব দেখে দেখে খরচ করা, তার মধ্যে আসে বাহুল্য খরচ না করা, সালামের উত্তর দেয়া এবং হাঁচির জবাব দেয়া, মানুষদের কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা, খেল তামাশা হতে বিরত থাকা এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস দূরীভুত করা।

(সূত্র ঃ মিনহাজ আল-ফিরকাতুন নাজীয়্যাহ-মুহাম্মাদ বিন জামীল যাইনূ-৭১-৭৩ পৃষ্ঠা)

ঈমানের তাৎপর্য ও ঈমানদারদের পরিচয়

একজন লোক মুখে যদি বলে 'আমি মু'মিন , আমার ঈমান আছে , তাহলে শুধু এ মৌখিক দাবি ও ঘোষণাতে মেনে নেয়া যেতে পারে না যে, সে সত্যিই মু'মিন এবং প্রকৃত ঈমানই তার রয়েছে। বস্তুত ঈমান নিছক মৌখিক দাবির বিষয় নয়। কেননা অনেক মুনাফিকও সত্যিকারভাবে ঈমান না এনে মৌখিক দাবি করেছে ঈমানের, নিজেদের মু'মিন বলে প্রচারও করেছে।

ঈমান বলতে নিছক সে সবকাজ বা আচার-আচরণও বুঝায় না, যা সাধারণতঃ মু'মিন লোকদের করতে দেখা যায়। কেননা অনেক ফাসিক লোকও খুব ভাল ভাল কাজ কর্ম করে থাকে। কিন্তু উহার দ্বারাই তারা ঈমানদাররূপে গণ্য হতে ও মর্যাদা পেতে পারেনি। ঈমানের নিগুঢ় তত্ত্ব হৃদয় মন দিয়ে জানতে পারা বা শুধু উপলব্ধি তো অনেকেই লাভ করে, কিন্তু তবু তারা প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার নয়।

ঈমান নিছক মুখে উচ্চারণের কাজ নয়। শুধু অঙ্গ- প্রত্যঙ্গ দিয়ে করার কাজও নয়, অথবা নয় কেবলমাত্র মানসিক উপলব্ধি। ঈমান মানব- মনের গভীরতর অনুভূতি। মন এই অনুভূতিতে গভীরভাবে নিমজ্জিত হয়। তা মনের সমগ্র দিককে পরিব্যাপ্ত করে নেয়। হৃদয়-অনুভূতি, ইচ্ছা ও সচেতন উপলব্ধি-এই সবই হচ্ছে ঈমানের প্রতিফলন।

প্রথমে প্রয়োজন ঈমানের তীব্রতর অনুভূতি। তার অস্তিত্ব হৃদয়ের পরতে পরতে কম্পন জাগিয়ে দেবে। সমগ্র হৃদয়লোক ঈমানের নির্ভুল চেতনা ও উপলব্ধির আলোকে

উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। বুদ্ধি-বিবেকগত অনুভূতি, সুদৃঢ় প্রত্যয় ও ঐকান্তিক বিশ্বাসে হবে অবিচল, অনড়, অটল। তাতে কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয় একবিন্দু স্থান পাবে না। কুরআন মাজীদে এ ঈমানের পরিচয় দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

নিঃসন্দেহে মু'মিন হচ্ছে কেবলমাত্র সেসব লোক, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে। অতঃপর তারা কোনরূপ সন্দেহের প্রশ্রয় দেয়নি।

এই অনুভূতি- উপলব্ধি অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। ইচ্ছা শক্তি তার অনুগত হবে। যাঁর প্রতি ঈমান আনা হয়েছে, তাঁর প্রতি হবে চিন্তা-অবনত, তাঁর সব আদেশ-নিষেধ মেনে নেবে ঐকান্তিক সন্তোষ সদিচ্ছা ও আত্মসমর্পণের ভাবধারা সহকারে।

কুরআনে এরূপ ঈমানের পরিচয় বিধৃত হয়েছে নিম্নোদ্ধৃত আয়াতটিতে ঃ (হে রাসূল) তোমার আল্লাহ্র নামে শপথ। এই লোকেরা কখনই ঈমানদার বিবেচিত হবে না, যতক্ষণ না তারা তোমাকে (হে নাবী ?) তাদের পারস্পরিক ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালাকারীরূপে মেনে নেবে। অতঃপর তোমার দেয়া ফয়সালা ও সিদ্ধান্তে তারা কোনরূপ দ্বিধা বা সংকোচ বোধ না করবে । আর তোমার ফয়সালাকেই তারা অকুণ্ঠ মনে ধার্য করে নেবে।

ঈমানের এই উপলব্ধি- অনুভূতি ক্রমশ মানসিক উচ্চতা ও তেজস্বিতা লাভ করবে এবং ব্যক্তিকে সে ঈমানের দাবি অনুযায়ী কর্মে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করে তুলবে। এরূপ ঈমানই প্রতিফলিত হবে চরিত্রে, নিত্যকার আচার-আচরণে। এ ঈমানই তাকে আল্লাহ্র পথে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত করবে। সে জিহাদ হবে ধন-মাল আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার মাধ্যমে। সে জিহাদ হবে নিজেকে আল্লাহ্র পথে পরিচালিত করার কঠোর কাঠিন্যকে সহ্য করে !

প্রকৃত কল্যাণ লাভ করেছে সেসব ঈমানদার লোক যারা তাদের সালাতে ভীত সন্তস্ত্র বিনীত, যারা অর্থহীন নিষ্ফল কাজ থেকে বিরত, যারা যাকাতের কার্য-সম্পাদনে সচেষ্ট, যারা তাদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণে সদা সতর্ক।

প্রকৃত ও সত্যিকার ঈমানদার লোকদের পরিচয় দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ "প্রকৃত ও মু'মিন সে সব লোক, যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান এনেছে, অতঃপর একবিন্দু সন্দেহকে তারা প্রশ্রয় দেয়নি আর নিজেদের সত্তা ও ধন-সম্পদ দিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করেছে। তারাই সত্যিকার ঈমানদার লোক।

ঈমানদার লোক সলাত আদায় করবে। সলাতে দাঁড়ালে তাদের হৃদয়-মন আল্লাহ্র ভয়ে কম্পিত, সন্ত্রস্ত হয়ে থাকবে। বাস্তব জীবনে তারা সর্ব প্রকার শরীআত-বিরোধী, অর্থহীন নিষ্ফল ও বেহুদা কাজ থেকে দূরে সরে থাকবে। তারা সব সময় নিজেদের পরিচ্ছন্ন পবিত্রকরণের কাজ করতে থাকবে। ধন-সম্পদের যাকাতও তারা এ উদ্দেশ্যই আদায় করতে থাকবে। তারা নৈতিকতার সংরক্ষণ করবে। কোন প্রকার

নৈতিক স্খলনকে তারা প্রশ্রয় দেবে না। তারা নিজেদের পূর্ণসত্তা দিয়ে নিজেদের ধন-মাল দিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদে লিপ্ত হয়ে থাকবে, আল্লাহ্র দ্বীনকে বিজয়ী ও সু-প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তারা সর্বাত্মক চেষ্টা করবে।

(সূত্র ঃ ঈমানের তাৎপর্য -মাওলানা আঃ রহীম-৩, ৪, ৫ পৃষ্ঠা)

ঈমানের দাবী ত্বাগূত থেকে বেঁচে থাকা

ত্বাগূত ঐ সমস্ত ব্যক্তিকে বলা হয় আল্লাহ্কে ছেড়ে যাদের 'ইবাদাত করা হয় এবং যে তাতে রাজি খুশি থাকে। তাকে ঐ সমস্ত কাজে অনুসরণ করা হয় যা আল্লাহ ও নাবীর অনুগত্যের বাইরে। আল্লাহ্ রাসূলদের পাঠিয়েছেন এই বলে যে, তারা যেন তাদের লোকদের বলে এক আল্লাহ্র 'ইবাদাত করতে এবং ত্বাগুতদের থেকে বিরত থাকতে। আল্লাহ বলেন-

"নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক কওমের কাছে রাসূল প্রেরণ করেছি এই বলে যে আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুতদের থেকে দূরে থাক। (সূরা নাহল-৩৬)

১। ঐ শায়ত্বান যে মানুষকে ডাকে অন্যের 'ইবাদাতের দিকে। প্রমাণ ঃ আল্লাহ পাক বলেন-

"হে বানী আদম! আমি কি তোমাদের সাথে এ চুক্তি করিনি, যে তোমরা শায়ত্বানের 'ইবাদাত করিওনা ? নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।" (সূরা ইয়াসিন)

২। ঐ অত্যাচারী বিচারক যে আল্লাহর হুকুম আহকামকে পাল্টিয়ে ফেলে। যেমন ঐ সমস্ত আইন বানান যা ইসলামের বিরুদ্ধে যায়। তার প্রমাণ ঃ আল্লাহ পাক বলেন ঐ মুশরিক শরী'আত প্রণয়নকারীদের ধিক্কার দিয়ে (যাতে আল্লাহ রাজী নন)

"তাদের কি এমন শরীক আছে যারা তাদের জন্য দ্বীনের মধ্যে ঐ জিনিস প্রবর্তন করে যার অনুমতি আল্লাহ দেননি।" (সূরাঃ শুরা-২১)

৩। ঐ বিচারক যে আল্লাহর আইন অনুযায়ী বিচার করে না। যদি অন্তরে এই ধারণা করে যে এটা এই জামানায় প্রয়োজন নয় অথবা অন্যের আইনকে জায়িজ মনে করে। আল্লাহ বলেন ঃ

"যারা আল্লাহ হতে অবতীর্ণ আইন দ্বারা বিচার করে না তারাই হচ্ছে কাফির।" (সূরা মায়িদা-৪৪)

৪। যে এই মিথ্যা দাবী করে যে, সে ভবিষ্যৎ জানে। কারণ আল্লাহ বলেন ঃ

"বল হে (মুহাম্মাদ) দুনিয়া ও আসমানের কেউ গায়িব জানে না আল্লাহ্ ছাড়া। (সূরা নামল- ৬৫)

৫। মানুষ যার 'ইবাদাত করে এবং আল্লাহকে ছেড়ে তার কাছে দু'আ করে এবং সে তাতে সন্তুষ্ট থাকে। প্রমাণঃ

"তাদের মধ্যে যে বলে আল্লাহ ব্যতীত আমি মাবুদ, তাকে তার বদলা দিব জাহান্নাম। এ ভাবেই আমি অত্যাচারীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি। (সূরা আম্বিয়া-২৯)

৬। জেনে রেখ, প্রত্যেক মু'মিনের উপর জরুরী হল তাগূতদের অস্বীকার করা যাতে সম্পূর্ণভাবে ঈমানদার হতে পারে। কারণ আল্লাহ বলেন ঃ

যে ত্বাগূতদের অস্বীকার করে এবং আল্লাহ পাকের উপর ঈমান আনে সে যেন এমন মজবুত হাতলকে ধারণ করল যা ভাঙ্গবার নয়; এবং আল্লাহ পাক সমস্ত কিছু শোনেন ও জানেন।" (সূরা বাকারা-২৫৬) [মিনহাজ আল- ফিরকাতুন নাজিয়াহ্-মুহাম্মাদ বিন জামীল যাইনু-৬৭, ৬৮ পৃঃ]

ঈমানের আলামত

ঈমানের আলামত কী? একজন মু'মিন কিভাবে তার ঈমান যাচাই করবে?

একজন ঈমানদারকে যখন ভাল কাজ আনন্দ দেয় এবং মন্দ কাজ তার কাছে খারাপ মনে হয়। তখন সে বুঝবে যে, তার ঈমান আছে! ভাল কাজ করতে যদি উৎসাহ বোধ না করে, আনন্দ না পায় অপরদিকে মন্দ কাজ যদি তার কাছে খারাপ না লাগে বরং মন্দ কাজেই তৃপ্তি পায় তাহলে বুঝতে হবে তার ঈমান লোপ পেয়েছে। উমামা বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, ঈমান কী? ঈমানের আলামত কী ?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

"তোমার ভাল কাজ তোমাকে আনন্দ দিলে আর খারাপ কাজ তোমার কাছে খারাপ লাগলে তুমি মু'মিন।" (আহমদ)

ঈমানের স্বাদ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'যার মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট থাকবে সে ঈমানের স্বাদ ও মজা পাবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার কাছে অন্য সব কিছুর চেয়ে অধিক প্রিয় হবে। সে কাউকে ভালবাসবে তো শুধু আল্লাহর জন্যই ভালবাসবে। আল্লাহ তাকে কুফর থেকে মুক্তি দেয়ার পর সে কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে এতটা অপছন্দ করবে যেমন সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করেন।' (বুখারী ও মুসলিম)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে আল্লাহ্কে 'রব' হিসাবে ইসলামকে দ্বীন হিসাবে এবং মুহাম্মাদকে রাসূল হিসাবে স্বীকার করে ও মেনে সন্তুষ্ট সে ঈমানের স্বাদ ও মজা আস্বাদন করে।'

দ্বিতীয় অধ্যায়

আল্লাহ শব্দের অর্থ

আব্দুল্লাহ ইব্নু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত,–অর্থাৎ আল্লাহ সেই, যাকে উপাসনা করে প্রত্যেক জিনিষই এবং যার গোলামী করে প্রত্যেক সৃষ্টিই। তাই আল্লাহ শব্দের অর্থ আল্লাহ উপাসনা ও গোলামী পাবার যোগ্য। (তাফসীরে তাবারী ১ম খণ্ড, ৪০-৪১ পৃঃ)

বিশিষ্ট তা'বিঈ যাহ্হাক বলেন, আল্লাহ্র নাম ইলাহ্- এই জন্য হয়েছে যে, সমস্ত সৃষ্টি তাদের সব প্রয়োজনে তাঁরই কাছে আশ্রয় নেয় এবং তাদের বিপদাপদে তাঁরই কাছে কান্নাকাটি করে। (তাফসীরে কুরতুবী ১ম খণ্ড ৭২ ও ৭৩ পৃঃ)

হাফিয ইব্ন কাসীর বলেন, রব্ব- আল্লাহ তাবা-রক ওয়া তা'আলার বিশেষ নাম। আল্লাহ্ এটা এমনই নাম যে- নামটা তাঁর ছাড়া আর কারো নেই। এই জন্য আরবদের ভাষায় অন্য কারো ব্যাপারে আল্লাহর নামটি পরিচিত হয়নি

(তাফসীর ইবনে কাসীর ১ম খণ্ড, ২০ ও ২১ পৃষ্ঠা)। [সূত্রঃ ঈমান ও আক্বীদা–অধ্যাপক মাওলানা হাফিয শাইখ আইনুল বারী আলিয়াভি–২০, ২১ পৃঃ)

আল্লাহ নামের বিকল্প শব্দ নেই

আল্লাহ নিজের নামের ব্যাপারে বলেনঃ হাল্ তা'লামু লাহূ সামিয়্যা। –অর্থাৎ তুমি তাঁর সমনামীকে জানো কি। (সূরা মারয়্যাম ৬৫ আয়াত)

এই জন্য আল্লাহ্ শব্দের প্রতিশব্দ পৃথিবীর কোন ভাষাতেই নেই। যেমন বাংলায় আল্লাহ্র ভাবার্থে ঈশ্বর ও ভগবান প্রভৃতি শব্দ বলা হয়। উক্ত শব্দগুলোর স্ত্রীলিঙ্গ ঈশ্বরী ও ভগবতী আছে। তাই এ শব্দগুলো আল্লাহ্র সমনাম হতেই পারে না। এজন্য বাংলা ভাষাতে আল্লাহ্র বিকল্প কোন শব্দ না লিখে আল্লাহ শব্দটিই লেখা উচিত।

তেমনি ইংরাজী ভাষায় আল্লাহ্র বিকল্প শব্দ god– লেখাও চলবেনা। কারণ, god এর স্ত্রী লিঙ্গ godes আছে। অথচ আল্লাহ বলছেনঃ আলাম তাকুল লাহু স্বা-হিবাহ্ –তাঁর কোন সঙ্গিনীই নেই। (সূরা আনআ-ম-১০১ আয়াত)

তাই ইংরাজীতেও আল্লাহর বিকল্প শব্দ– "গড্" না লিখে আল্লাহ্-ই লিখতে হবে। ফারসী ভাষায় আল্লাহ্র বিকল্প শব্দ–'খোদা'–লেখা হয়। বাংলা ভাষাও খোদা শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। খোদা শব্দটাও আল্লাহ্র সমনামী শব্দও নয়। কারণ, খোদা শব্দের অর্থ মালিকও হয়। যেমন ফারসীতে বলা হয়– না-ও খোদা। বহুল প্রচলনে না–খোদ–অর্থাৎ নৌকার মালিক মাঝি। তাই আল্লাহর বিকল্প হিসাবে খোদা শব্দটি ব্যবহার করলে আল্লাহ্র অর্থ উপাস্য হওয়ার মধ্যে বিকৃতভাব প্রকাশ পায়। যার মধ্যে কিছুটা শির্কের গন্ধ আসে। অতএব, আল্লাহ্র বিকল্প শব্দ হিসেবে খোদা শব্দ লেখাও চলবে না। (সূত্র ঃ ঈমান ও আক্বীদাহ্ –ঐ– ২১, ২২ পৃষ্ঠা)

আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ

আলকুরআনের প্রায় পাঁচশো আয়াত এমন আছে যাতে আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের প্রমাণ রয়েছে। (ঈমান ও আক্বীদা-৩০ পৃঃ)

আল্লাহ নিজের অস্তিত্বের প্রমাণে এক জায়গায় বলেনঃ আর যমীনের মধ্যে বহু টুকরা রয়েছে পাশাপাশি। আর বাগানও রয়েছে আঙ্গুরের এবং শষ্যক্ষেত ও খেজুর গাছও আছে, যা গোছা গোছা ছড়া এবং কিছু বিনা গোছা গোছা ছড়া। একই পানি দ্বারা এতে সেচ দেয়া হয়। এমতাবস্থায় আমি (ঐ ফলগুলোর) খাওয়ার স্বাদে ওদের কিছুকে অন্যের উপরে প্রাধান্য দিয়ে থাকি। নিশ্চয় এসবের মধ্যে (আমার কুদরতের) বহু নিদর্শন রয়েছে সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা বুঝে থাকে (সূরা আর-র'দ-৪র্থ আয়াত) অর্থাৎ একটি গাছেই একটি ফল মিষ্টি, অন্যটি পানসে এবং আরেকটি তেতো। তা হয় কি করে? এই তারতম্যকারী কে? তিনিই আল্লাহ।

বিশিষ্ট তাবিঈ ইমাম জাফর সা-দিক (মৃত ৮৪ হিজরী) এর সামনে এক নাস্তিক সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র অস্তিত্ব অস্বীকার করে। **তখন ইমাম জা'ফর** তাকে বলেন, তুমি কখনো সমুদ্রে নৌকায় চড়েছো? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি কখনো তাতে ভয়ের সম্মুখীন হয়েছো? সে বললো, হ্যাঁ। সে আরো বললো, একদিন ভীষণ ঝড় উঠেছিল। যা নৌকাটিকে ভেঙ্গে ফেললো এবং মাঝিদের ডুবিয়ে মারলো আমি একটি তক্তায় শুয়ে পড়লাম। অতঃপর তক্তাটাও আমার হাত থেকে সরে গেল। তারপর সমুদ্রের ঢেউগুলো আমাকে ঝাপটা মারতে মারতে এক কিনারায় ফেলে দিল।

এবার ইমাম সাহেব বললেন, প্রথমে তো তোমার ভরসা নৌকা ও মাঝির উপরে ছিল? তারপরে ঐ তক্তাটির উপরে? হয়তো তা তোমাকে উদ্ধার করবে আর পরেই যখন তোমার হাত ছাড়া হয়ে গেল তখন তুমি নিজেকে নিশ্চয়ই মরণের হাতে সঁপে দিয়েছিলে? নাকি বাঁচার আশা করেছিলেন? সে বললো তারপরেও আমি বাচাঁর আশা করেছিলাম।

তখন ইমাম সাহেব বললেন, তাহলে তুমি কার কাছে বাঁচার আশা করেছিলে? সে চুপ হয়ে গেল। তিনি বললেন, ঐ মরণাপন্ন অবস্থায় তুমি যার কাছে আশা রেখেছিলে এবং যিনি তোমাকে মরা থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন তিনিই আল্লাহ্। নাস্তিকটি তখন তাঁর হাতে ইসলাম কবূল করেন। (তাফসীর কাবীর ১মখণ্ড, ২১০ পৃষ্ঠা)

কিছু নাস্তিক **ইমাম শা-ফিঈ** (মৃত ২০৪) রাহঃ-কে জিজ্ঞেস করেন যে, সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের প্রমাণ কি? তখন তিনি বলেন, তুত গাছের পাতা ও স্বাদ এবং ওর রং ও গন্ধ আর ওর প্রকৃতি তোমাদের কাছে একই রকম কিনা? তারা বললো, হ্যাঁ এবার তিনি বললেন, উহার পাতা গুটিপোকা খায়। ওর পেট থেকে রেশম বের হয়। আর মৌমাছি খেলে ওর পেট থেকে মধু বের হয়। উহা বকরী খেলে তার পেট থেকে বকরীর পায়খানা বের হয়। আর ওটাকেই হরিনও খায়। কিন্তু তার পেটে মৃগনাভী তৈরী হয়। তাহলে তিনি কে ? যিনি এইসব জিনিষকে একটি মাত্র প্রকৃতি থেকে তৈরী করেছেন? এই উত্তরে তারা সন্তুষ্ট হল এবং তাঁর হাতে তারা ইসলামও গ্রহন করলো। তাদের সংখ্যা ছিল সতের জন। (তাফসীরে কাবীর ১ম খণ্ড, ২১০ পৃষ্ঠা)
[সূত্র –ঐ– ৩০– ৩৫ পৃষ্ঠা]

আল্লাহ্ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করার সীমা

বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুল্লাহ ইব্নু আব্বাস (রাঃ) বলেন, তোমরা আল্লাহ্র সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা কর কিন্তু আল্লাহ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করো না। তাহলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। তাঁর থেকেই বর্নিত, তোমরা আল্লাহ্র সম্পদগুলো সম্পর্কে মাথা ঘামাও। কিন্তু আল্লাহ সম্পর্কে মাথা ঘামায়োনা । (আক্বীদাতুল মুসলিমীন ১ম খণ্ড, ১৩৯ পৃষ্ঠা)

প্রসিদ্ধ সাহাবী আবূ যর (রাঃ) বলেন, তোমরা আল্লাহ্র সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা কর। কিন্তু আল্লাহ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করো না তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে। (ঐ, ১৩৯) [সূত্র ঃ ঐ – ১৯ পৃষ্ঠা]

উপাস্য এক না একাধিক

পৃথিবীর সমস্ত ধর্মই স্বীকার করে যে, আল্লাহ সবারই উপাস্য। তথাপি একমাত্র ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্মের লোকেরা একাধিক উপাস্যের উপাসনা করে। যেমন হিন্দু শাস্ত্র বলে পৃথিবীর সব তিনজনের উপর ন্যস্ত ঃ ১। ব্রহ্মা– যিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা। ২। বিষ্ণু– যিনি পালনকর্তা। ৩। শিব তথা মহাদেব– যিনি সংহারকর্তা (আক্ব-য়িদে ইসলাম কাসিমী ৩১ পৃষ্ঠা)

হিন্দু ধর্মাবলম্বীগণ বিশ্বাস করেন যে, ভগবান মানুষের রূপধারণ করে কখনো কখনো পৃথিবীতে অবতরণ করেন। এই ধারণাকে তাঁদের পরিভাষায় অবতারবাদ বলা হয়। তাই হিন্দুরা উপরে বর্ণিত তিন রকম গুণে গুণান্বিত – ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব–রূপী এক ইশ্বরের পূজার সাথে তেত্রিশ কোটি দেবতারও পূজা করে। ফলে হিন্দুমতে উপাস্য অসংখ্য। হিন্দু ধর্ম নেতাদের মতে হিন্দু ধর্মনীতি এখন থেকে চার হাজার বছর আগে প্রকাশিত হয়েছে। (জা-মিউল আক্বা-য়িদ-৫ম পৃষ্ঠা)

খৃষ্টপূর্ব ৫৬৩ বছর আগে বুদ্ধদেবের জন্ম এবং তাঁর মৃত্যু হয় খৃষ্টপূর্ব ৪৮৮ বছর আগে। বুদ্ধদেব প্রচারিত ধর্মের নাম বৌদ্ধধর্ম (ঐ-১৫ পৃষ্ঠা)। উক্ত বৌদ্ধ ধর্মমতে মানুষগণ সাধানাগুণে অর্থাৎ বোধিসত্ব, বুদ্ধ এইরূপ উত্তরোত্তর দেবত্বপদ প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। (শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত বৌদ্ধধর্ম ১৩৪ পৃষ্ঠা)

উক্ত বর্ণনাটি প্রমাণ করে যে, বৌদ্ধ ধর্মমতে কোন কোন মানুষ দেবতা হতে পারেন। ফলে বৌদ্ধমতেও দেবতা তথা উপাস্য একাধিক।

খৃষ্টপূর্ব ১৪০০ বছর আগে মূসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ। যাঁকে ইয়াহুদী মতাদর্শের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।(জামি্উল আক্ব-য়িদ-২২ পৃষ্ঠা) ইয়াহুদীরা তাঁদের এক নাবী উযাইর আলাইহিস সালাম্কে আল্লাহ্র ছেলে বলে। (সূরা তাওবাহ

৩০ আয়াত) সুতরাং ইহুদী ধ্যান–ধারণায়ও পরোক্ষভাবে উপাস্য একজন নয়। আসমানী গ্রন্থধারী খৃষ্টানদেরকে আল্লাহ বলেন, তোমরা বলোনা, (আল্লাহ) তিনজন। (সূরা নিসা-১৭১ আয়াত)

অন্য জায়গায় আল্লাহ বলেন, তারা অবশ্যই কুফরী করেছে যারা বলেছে যে আল্লাহ তিনজনের তৃতীয়জন। (সূরা মা-য়িদা ৭৩ আয়াত)

তাই খৃষ্টানমতে উপাস্য তিনজন। পার্সী ও অগ্নিপূজকগণ মনে করে যে, স্রষ্টা দুজন। একজন ভাল এর স্রষ্টা। যাঁর নাম ইয়ায্দাঁ। আর দ্বিতীয়জন মন্দের স্রষ্টা যাঁর নাম আহরেমান। সা-বিয়ীরা অগণিত তারকাকে উপাসনা করে। তাই তাঁদের মতে উপাস্য অসংখ্য। হিন্দু, স্ব-বিয়ী ও রোমান ক্যাথিলিক খৃষ্টানগণ উপাস্যের ধারণার জন্য কোন দেহধারীর প্রয়োজন বোধ করেন। ফলে তাঁরা উপাস্যের নাম করে বহু মূর্তি আবিষ্কার করেন। কিন্তু ইসলামী মতে উপাস্য কেবলমাত্র একজন।

একাধিক উপাস্যের প্রতিবাদে যুক্তি দিয়ে আল্লাহ বলেনঃ লাও কা–না ফীহিমা আ–লিহাতুন ইল্লাল্লাহু লাফাসাদাতা– ওদের (আসমান ও যমীনের) মধ্যে যদি আল্লাহ ছাড়া বহু উপাস্য থাকতো তাহলে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেতো। (সূরা আম্বিয়া-২২ আয়াত)

আল্লাহ আরো বলেনঃ অমা–কানা মাআহূ মিন ইলা–হিন ইযাল লাযাহাবা কুল্লু ইলা–হিম বিমা– খালাক্বা ওয়া লাআলা– বা'যুহুম আলা– বা'য সুব্হা–নাল্লাহি আম্মা ইয়াসিফুন– আর তাঁর (আল্লাহ্র) সাথে কোন উপাস্যই নেই। থাকলে প্রত্যেক উপাস্যই তা নিয়ে চলে যেত যা সে সৃষ্টি করেছে এবং তাদের একে অন্যের উপরে অবশ্যই বড়াই করতো। আল্লাহ তা থেকে পবিত্র যা তারা বর্ণনা করে। (সূরা মু'মিনূন ৯১ আয়াত) [সূত্র ঃ ঐ– ৪০ ৪০–৪২ ও ৪৪, ৪৫ পৃঃ]

আল্লাহ কি নিরাকার ?

আল্লাহ গোটা বিশ্বজাহান ও তাতে ছোট বড় যা কিছু আছে সবকিছুর স্রষ্টা, তাঁর সৃষ্টির সাথে তাঁর কোন ধরনের সাদৃশ্যতা নেই। কোন সৃষ্টির সাথে তাঁর উপমা বা তুলনা করা চলবে না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ নিরাকার। 'আল্লাহ নিরাকার' এর পক্ষে কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামী উম্মাহর অতীত হকপন্থী কোন ইমাম ও আলিমের সমর্থন নেই। এটি কুরআন–সুন্নাহর সমর্থন বর্জিত একটি ভ্রান্তমত ও বিশ্বাস।

আল-কুরআনের কোন আয়াত এবং কোন সহীহ্ হাদীস দ্বারাও একথার প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, আল্লাহ্র কোন আকার নেই তিনি নিরাকার। কিন্তু এর বিপরীত কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমানিত হয় যে, আল্লাহ্র হাত ও পা এবং চেহারা ও চোখ প্রভৃতি আছে। কিন্তু আল্লাহ্র ঐ সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কিরূপ? তা উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যাবে না। কারণ, আল্লাহ্ বলেন, লাইসা কামিসলিহী শাইয়ান– তাঁর কোন উপমা নেই। (সূরা আশ শুরা ১১ আয়াত)। আল্লাহ আরো বলেন ঃ ফালা– তায্রিবু লিল্লা-হিল্ আম্সাল– তোমরা আল্লাহ্র জন্য বিভিন্ন রকম উপমা পেশ কারোনা। (সুরাতুন নাহ্ল ৭৪ আয়াত)। তাই ইসলামী মতে আল্লাহর তুলনাহীন আকার।

✪ **চেহারা** ঃ আল্লাহ তা'আলা আলকুরআনের চোদ্দটি আয়াতে তাঁর চেহারার প্রমাণ দিয়েছেন। (আক্বীদাতুল মুসলিমীন ২য় খণ্ড, ৪৬৬ পৃষ্ঠা)।

তম্মধ্যে দুটি বিখ্যাত আয়াত এই ঃ ওয়া ইয়াব্কা অজহু রাব্বিকা যুল-জালা-লি অলইক্রা-ম্–তোমার গাম্ভীর্য ও সম্মান ওয়ালা প্রতিপালকের চেহারা চিরকাল বাকী (স্থায়ী) থাকবে (সূরা আর্ রহমান– ২৭ আয়াত)। তাঁরই উক্তি কুল্লু শাইয়িন হা-লিকুন ইল্লা- অজহাহ্– তাঁর চেহারা ছাড়া সব জিনিষই ধ্বংস হবে (সূরা তুল ক্বসাস ৮৮ আয়াত)

✪ **চোখ** ঃ আল্লাহ তা'আলা নিজের দেখার ব্যাপারে কুরআনের পঞ্চাশটি আয়াত প্রমাণ দিয়েছেন। কিন্তু আইন (চোখ) ও আ'ইউন (চোখগুলো) শব্দ পাঁচটি আয়াতে ব্যবহার করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেনঃ ফাইন্নাকা বি-আইউনিনা–অর্থাৎ (হে মুহাম্মাদ! তোমার প্রতিপালকের হুকুম মোতাবেক তুমি ধৈর্য ধর।) কারণ, তুমি আমার চোখের সামনে আছ (সূরা তুর ৪৮ আয়াত)

সহীহ্ হাদীসে আছে আব্দুল্লাহ্র বর্ণনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা টেরা নন। অথচ মাসীহুদ দাজ্জাল ডান চোখে টেরা। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪৭২ পৃষ্ঠা) কুরআনে উক্ত আয়াতগুলো এবং বিভিন্ন হাদীস প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্র চোখ আছে। তবে ওর ধরনকরণ সবারই অজানা। কারণ, ওর নেই কোন তুলনা।

✪ **হাত** ঃ আল্লাহ তা'আলা কুরআনের তেরটি আয়াতে নিজের হাতের প্রমাণ দিয়েছে যেমন তিনি বলেন ঃ তাবা-রাকল্লাযী বি-ইয়াদিহিল মুলক– সর্বদা বরকতময় তিনি যাঁর হাতে রয়েছে সবরকম সাম্রাজ্য। (সূরাতুল মুলক-১)

আল্লাহ ইবলীসকে বলেন ঃ মা- মানাআকা আন তাসজুদা লিমা–খালক্বতু বিইয়াদাইয়া– তোমাকে কিসে বাধা দিল তাকে সিজদাহ করতে, যাকে আমি আমারই দুটি হাত দিয়ে সৃষ্টি করেছি। (সূরা স্ব-দ্ ৭৫)।

বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুল্লাহ ইব্নু আমর ইব্ন আ-স বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাত দিয়ে সৃষ্টি করেননি তিনটি ছাড়া। তিনি আদমকে সৃষ্টি করেছেন নিজ হাতে এবং জান্নাতুল ফিরদাওসে গাছ লাগিয়েছেন নিজ হাতে, আর তাওরা-ত, লিখেছেন নিজ হাতে। (ক্বত্-ফুস্ সামার ফী বায়া-নি আকীদাহতি আহ্লির আসর ৫৫ পৃষ্ঠা, কিতাব-বুস সিফা-ত্ লিদ্ দারূকুতনী ২৭ পৃষ্ঠা, আল্ আসমা - আসসিফাত-তলি বাইহাক্বী ৩১৮ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্র যেহেতু কোন উদাহরণই নেই সেহেতু তাঁর প্রকৃত হাতেরও কোন দৃষ্টান্ত নেই।

✪ **আল্লাহ্র পা ও পায়ের পাতার প্রমাণ** ঃ আবূ হুরাইরার বর্ণনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জাহান্নাম ততক্ষণ ভরবেনা যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর পা জাহান্নামে রেখে দেবেন তখন জাহান্নাম বলতে থাকবে ব্যাস! ব্যাস ! ! (বুখারীও মুসলিম, মিশকাত ৫০৫ পৃষ্ঠা) ইব্নু আব্বাসের বর্ণনায় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আলকুর্সী মাওয়াইল ক্বদামাইন– কুরসী হচ্ছে আল্লাহর দুটি পায়ের পাতা রাখার জায়গা। (মুসতাদরকে হা-কিম ২য় খণ্ড, ২৮২ পৃষ্ঠা)

✪ **আল্লাহর মধ্যে কোন দোষ নেই** ঃ আল্লাহ্ তা'আলার মধ্যে এমন কিছু গুণ আছে যে, তার বিপরীত দোষ তাঁর মধ্যে থাকতেই পারে না। যেমন মরণ, অজ্ঞতা, অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বধিরতা, অন্ধতা, অবসন্নতা, তন্দ্রা ও নিদ্রা, বোবা হওয়া অত্যাচার ও অবিচার করা প্রভৃতি।

আল কুরআনের পাঁচটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর জীবনের প্রমাণ দিয়েছেন। তা হল সূরা বাক্বারার ২৫৫ আয়াত। সূরা আল-ইমরানে ৫ম আয়াত। সূরা ত্বহার ১১১ আয়াত। সূরা মূ'মিনের ৬৫ আয়াত। সূরা ফুরকানের ৮৫ আয়াত। শেষোক্ত আয়াতটি তিনি বলেনঃ অতাওয়াক্কাল্ আলাল হাইয়িল লাযী লা-ইয়ামূত, অর্থাৎ তুমি সেই সত্ত্বার উপর ভরসা কর যিনি জীবিত। তিনি মরবেন না। এই আয়াতসহ বহু আয়াত প্রমাণ করে যে, আল্লাহ চিরজীবি। সেহেতু তাঁর মরণ ও ধংস কখনই হবে না। তাই তিনি ছাড়া সব জিনিষই ধংসশীল। (সূরা আল ফুরকারন)

✪ **অজ্ঞতা** ঃ আল্লাহ তা'আলা সবজান্তা। আর প্রমাণ তিনি কুরআনের তিনশো পঞ্চাশটি আয়াতে দিয়েছেন। (আক্বীদাতুল মুসলিমীন, ২য় খণ্ড, ৫১১ পৃষ্ঠা)

যেমন আল্লাহ বলেন, যাতে তোমরা এটা জেনে নাও যে, আল্লাহ্ সে সব জানেন যা কিছু আকাশ মণ্ডলীতে আছে এবং যা কিছু যমীনে আছে। আর এটাও যে, আল্লাহ সব জিনিসেরই জ্ঞানী। (সূরা মা-য়িদা-৯৭)।

✪ **অক্ষমতা** ঃ আল্লাহ বলেন ঃ ইন্নাল্লাহ-হা আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর– নিশ্চয় আল্লাহ সব জিনিষেরই উপর কর্তৃত্বকারী। (সূরা বাকারা–১৪৬)

এই আয়াতসহ বহু আয়াত ও হাদীস প্রমাণ করে যে, একমাত্র আল্লাহ সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী। তাই কোন জিনিষই কোন ব্য পারে তাঁকে তাঁর কর্তৃত্ব খাটাতে বাধা দিতে পারে না।

✪ **বাধ্যবাধকতা** ঃ আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা তা করতে পারেন। তাঁর এই ইচ্ছা ও ইরাদার প্রমাণ কুরআনের দুশো ছিয়াশিটি আয়াতে বর্ণিত আছে।
(আকীদাদুল মুসলিমীন ২য় খণ্ড, ৫১১ পৃষ্ঠা)

যেমন আল্লাহ বলেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ তা করেন যা তিনি চান (সূরা হাজ্জ ১৮ আয়াত) তিনি বলেন, তোমার প্রতিপালক নিশ্চয়ই তা কার্যকরী করেন যা তিনি ইচ্ছা করেন। (সূরা হুদ ১০৭)

অতএব উক্ত ঘোষনা মোতাবেক আল্লাহ যেহেতু যা ইচ্ছা তা করতে পারেন সেহেতু তাঁকে কেউ কোন কাজ করতে বাধ্য করতে পারে না।

✪ **বধিরতা ও অন্ধতা** ঃ আল্লাহ তা'আলা কুরআনে সাতান্নটিরও বেশী আয়াতে নিজের জন্য শোনার প্রমাণ দিয়েছেন পঞ্চাশটিরও বেশী আয়াতে নিজের জন্য দেখার প্রমাণ দিয়েছেন। (আকীদাতুল মুসলিমীন ২য় খণ্ড, ৪৮২ ও ৪৮৬ পৃষ্ঠা)

খাইবার যুদ্ধের সময় সাহাবায়েকিরাম যখন খুব চেঁচিয়ে তাকবীর দিচ্ছিলেন তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু- আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা শান্ত হও। কারণ, তোমরা যাঁকে ডাকছো তিনি বধির নন। (বুখারী মুসলিম) তাই আল্লাহ্র মধ্যে বধিরতা নেই।

✪ **অবসন্নতা ও ক্লান্তি ঃ** অভিশপ্ত ইহুদীরা বলে যে, আল্লাহ তা'আলা ছয়দিনে আসমান ও যমীন প্রভৃতি সৃষ্টি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তাই তিনি শনিবারে একটু বিশ্রাম নেন। এর প্রতিবাদে আল্লাহ বলেন, আমি অবশ্যই সৃষ্টি করেছি আকাশমণ্ডলী ও যমীনকে এবং ওদের উভয়ের মাঝে যা কিছু আছ তাকেও। অথচ কোন রকম ক্লান্তি আমাকে ছুঁতে পারেনি। (সূরাঃ ক্ব-ফ-৩৮) তাই আল্লাহ্র মধ্যে ক্লান্তি নেই।

✪ **তন্দ্রা ও নিদ্রা ঃ** ক্লান্তি আসলে ঘুম ঘুম ভাব লাগে ফলে চোখ বুঁজে আসে। তাই মানুষ ঝিমুতে থাকে। আল্লাহ্র যেহেতু ক্লান্তিই আসে না, সেহেতু তাঁর ঝিমুনী ও ঘুমের প্রশ্নই ওঠেনা। তাই আল্লাহ বলেন, তন্দ্রা আর না নিদ্রা তাঁকে ধরতেই পারেনা। (সুরা-বাকারা -২৫৫)

✪ **বোবা হওয়া ঃ** আল্লাহ তা'আলা কথা বলেন এ কথার প্রমাণে কুরআনে দুশো পঁচাত্তরটি আয়াত আছে। তন্মধ্যে বারটি আয়াতে স্বয়ং কুরআনকেই আল্লাহর কালাম বলা হয়েছে। (আক্বীদাতুল মুসলিমীন ২য় খণ্ড, ৪৭০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ বলেন, আর আল্লাহ মূসা (আঃ)-এর সাথে কথা বলেছেন।

(সুরাতুন নিসা -১৪)

ইবনু আব্বাসের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লা-হু আলাইহি আসাল্লাম বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাবারাক তা-তা'আলা মূসা আলাইহিস সালামের সাথে এক লাখ চল্লিশ হাজার বাক্য গোপনে বলেছেন। (আশ্শারীআহ্ ৩১৭ পৃষ্ঠা)

✪ **অত্যাচার ও অবিচার ঃ** আল্লাহ্ বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের উপরে কিছুই অত্যাচার করেন না। এমতাবস্থায় কিন্তু মানুষেরা নিজেদেরই উপরে অত্যাচার করে থাকে। (সূরা ইউনুস ৪৪)

তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ অনু সমানও অত্যাচার করেন না। (সূরাতুন নিসা ৪০)
[সূত্র ঃ প্রশ্নউত্তরে ইসলামী আক্বীদা– আ. ন. ম. রশীদ আহমাদ, ৪৫ পৃষ্ঠা ঃ ও ঈমান ও আক্বীদা–ঐ– ৫৮–৭০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ কি সর্বত্র বিরাজমান ?

আল কুরআন ও হাদীসে বহু তথ্য এমন আছে, যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ আছেন মানুষের সাথে। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ অহুওয়া মাআকুম মাআইনামা কুনতুম– তিনি তোমাদের সাথে আছেন তোমরা যেখানেই থাকো না কেন।

(সূরাতুল হাদীদ-৪)

তিনি বলেন, আমি মানুষের ঘাড়ের শিরার চেয়েও তার বেশী নিকটে আছি। (সূরা ক্বাফ-১৬৬) উবা-দাহ্ ইবনে সামিতের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু– আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, উত্তম ঈমান হচ্ছে, তোমার একথাটা জানা যে, আল্লাহ তোমার সাথে আছেন তুমি যেখানেই থাকোনা কেন (তাবারানী, শারহুল আক্বীদাতুল ওয়া-সিত্বিয়্যাহ

১১৭ পৃষ্ঠা)। অন্য বর্ণনায় তিনি সাহাবায়িকিরামকে বলেন, তোমরা যাঁকে ডাকছো তিনি তোমাদের সওয়ারীর ঘাড়ের চেয়েও বেশী নিকটে আছেন। (বুখারী, মুসলিম, আকীদাহ ওয়া-সিত্বিয়্যাহ ১৭পৃষ্ঠা)

উক্ত আয়াত ও হাদীসগুলো প্রমাণ করে যে, আল্লাহ মানুষের সাথে আছেন এবং অতি নিকটেই আছেন। এর ব্যাখ্যার ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহঃ) বলেন– ওয়াহুয়া মাআমুক তিনি তোমাদের সাথে আছেন– এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির সাথে মিশ্রিত হয়ে আছেন। কারণ, 'সাথে' শব্দটি ভাষাগতভাবেও ভাবটাকে সমর্থন করেনা এবং (সাহাবী ও তাবিঈ প্রমুখ) পুর্ববর্তী উম্মত যার উপরে একমত এই ভাবটা তার পরিপন্থী। আর আল্লাহ যে-প্রকৃতির উপর সৃষ্টিজীবকে তৈরী করেছেন এটা তারও বিরোধী যেমন চাঁদ আল্লাহর সবচেয়ে ছোট সৃষ্টির মধ্যে হতে তাঁর বিভিন্ন নির্দশনের একটি নিদর্শন। যা আকাশে রাখা আছে। অথচ তা একজন সফরকারী এবং একজন ঘরে বসবাসকারী উভয়েরই সাথে থাকে তারা যেখানেই থাকুক না কেন। তেমনি আল্লাহ্ তা'আলার আরশের উপরে আছেন। সেখান থেকে তিনি তাঁর সৃষ্টিকে পর্যবেক্ষণ করছেন ও তত্ত্বাবধান করছেন। এসব কথা আল্লাহ নিজেই বলেছেন যে, তিনি আরশের উপরে আছেন এবং তিনি আমাদের সাথে আছেন। তাই এসবের ভাবার্থে কোন রকম বিকৃত অর্থ করার প্রয়োজন নেই। (ঐ, ১৭ পৃষ্ঠা, মাজমূই ফাতয়া ইবনে তাইমিয়াহ ৩য় খণ্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা)

কুরআন মাজীদে আল্লাহ পাক নিজ সম্পর্কে সাতবার বলেছেন যে, তিনি আরশের উপর 'অধিষ্ঠিত হয়েছেন।' (আ'রাফ–৫৪, ইউনুস–৩, রা'দ–২, ত্বাহা–৫, ফুরক্বান–৫৯, সিজদাহ–৪, হাদীদ–৪)

আল্লাহ আরশে আসীন। আর 'আরশ' হচ্ছে সপ্তম আকাশের উপর। এটি মুসলিমদের একটি প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস। আল্লাহ পাক যে তাঁর মহান আরশে অধিষ্ঠিত এবং আরশ যে উপরে অবস্থিত এ বিষয়ে কুরআনের অনেক দলীল ও প্রমাণ রয়েছে। এখানে তার কয়েকটি পেশ করা হলো ঃ

১. «تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ» 'ফেরেশতাগণ এবং রূহ আল্লাহ তা'আলার দিকে ঊর্ধগামী হয়। (সূরা মাআরিজ–৪)

২. «إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ» 'তাঁরই দিকে আরোহন করে উত্তম কথা এবং সৎকর্ম তাকে তুলে নেয়।' (সূরা ফাতির–১০)

৩. « بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ » 'বরং আল্লাহ তাঁকে (ঈসাকে) উঠিয়ে নিয়েছেন নিজের দিকে (মানে নিজের কাছে)।' (সূরা নিসা–১৫৮)

৪. আল্লাহ কুরআন মাজীদের অনেক জায়গায় উল্লেখ করেছেন যে, কিতাব (কুরআন) তাঁর কাছে থেকে নাযিল বা অবতীর্ণ হয়েছে। 'নাযিল' মানে– 'অবতরণ' উপর থেকে নিচে হয়। পাশাপাশি স্থান থেকে নাযিল বা অবতরণ হয় না।

«كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ»

'এটি একটি কিতাব যা আমি তোমার প্রতি অবতরণ করেছি যাতে তুমি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আন।' (সূরা ইবরাহীম-১)

«إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّٰهُ»

'নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে আল্লাহ তোমাকে যা বুঝিয়াছেন তা দিয়ে মানুষের মধ্যে শাসন ও ফায়সালা করতে পার।' (সূরা নিসা-১০৫)

«إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ»

'নিশ্চয় আমি ইহা (কুরআন) ক্বদরের রাতে নাযিল করেছি।' (ক্বদর-১)

৫. হিজরতের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বছরের অধিক কাল সময় বায়তুল মাকদাসের দিকে ফিরে সলাত আদায় করেছেন। তিনি মনে মনে কামনা করতেন যেন কা'বাকে ক্বিবলা করা হয়। তিনি আকাশের দিকে বারবার মুখ ফিরিয়ে তাঁর মনের এ কামনা বহিঃপ্রকাশ ঘটাতেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ ইরশাদ করেনঃ «قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ» 'নিশ্চয়ই আমি তোমাকে বার বার আকাশের দিকে তাকাতে দেখেছি।" (সূরা বাকারা-১৪৪)

আল্লাহর পরিচয় সবচেয়ে বেশি জানেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি মনে মনে কামনা করতেন যেন 'কা'বাকে কিবলা করা হয়। আর এর কামনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন আকাশের দিকে বার বার তাকিয়ে। এর কারণ কি ? এ কারণ কি এটি নয়? যে মহান আল্লাহ 'সর্বত্র বিরাজমান' নন বরং তাঁর অবস্থান উপরে?

অনেক সহীহ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত যে মহান আল্লাহ আরশে আযীমে অধিষ্ঠিত আর আরশে আযীমের অবস্থান সপ্তম আকাশের উপর। এখানে এ ধরনের কয়েকটি হাদীস পেশ করা হলোঃ

❑ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'যখন তোমরা (আল্লাহর কাছে) জান্নাত চাইবে তখন 'ফিরদাউস' চাইবে কেননা এটি জান্নাতের মাঝখানে আর তার উপর করুণাময় (আল্লাহর) আরশ।" (বুখারী)

❑ যয়নব (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যান্য স্ত্রীগণের উপর গর্ব করে বলতেন ঃ

'তোমাদেরকে তোমাদের পরিবারের লোকজন বিয়ে দিয়েছেন। আর আমাকে (রাসূলের সাথে) বিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ্, সাত আকাশের উপর থেকে।' (বুখারী)

উল্লেখ্য যে, যায়িদ বিন হারিসা (রাঃ)-এর সাথে যয়নব (রাঃ)-এর বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটার পর আল্লাহর ইশারায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যয়নব (রাঃ)-কে বিয়ে করেছিলেন।

❑ আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের মাঝে রাতে ও দিনে পালাক্রমে মালাইকাগণ (ফেরেশতা) আসেন। তাঁরা আসর ও ফজর নামাযের সময় একত্রিত হন। অতঃপর যারা তোমাদের মাঝে রাত্রি কাটান তারা উপরে উঠে যান। (আল্লাহ) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন- অথচ তিনি তাদের ব্যাপারে ভাল করেই জানেন- আমার বান্দাদের কিভাবে ছেড়ে আসলে ? তারা মালাইকা (ফেরেশতাগণ) বলেন, আমরা তাদেরকে সালাত আদায় অবস্থায় ছেড়ে এসেছি আর যখন তাদের কাছে এসেছিলাম তখনও তারা সলাত আদায় করছিল। (বুখারী)

এ হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, 'ফেরেশতারা উপরে উঠে যান।'

৪. মহান আল্লাহ যে সর্বত্র বিরাজমান নন বরং তিনি সপ্তম আকাশের উপরে আরশে অবস্থান করছেন তার সবচেয়ে সুস্পষ্ট ও শক্তিশালী প্রমাণ হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইসরা ও মি'রাজ। তাঁর ইসরা ও মিরাজের ঘটনা কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ্ দ্বারা প্রমাণিত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রথম আকাশ, দ্বিতীয় আকাশ, তৃতীয় আকাশ এভাবে সপ্তম আকাশে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এ ব্যাপার হাদীসের শব্দ হচ্ছে- عرج به (তাঁকে উপরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে)। সপ্তম আকাশের পর তাঁকে আরো উপরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। হাদীসের ভাষায়- 'তারপর তাঁকে (সপ্তম আকাশ) উপরে উঠানো হয়েছে। (যার দূরত্ব) আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। অবশেষে সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছেন।' (বুখারী)

কুরআন-সুন্নাহর উল্লেখিত সুস্পষ্ট বলিষ্ঠ দলীল ও প্রমাণসমূহের পরও কোন মুসলিম কি একথা বলতে পারে যে, আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান? এ ধরনের মত ও বিশ্বাস সুস্পষ্ট গোমরাহী।

বিখ্যাত তাবিঈ সুফিয়ান সাওরী বলেনঃ তিনি তোমাদের সাথে আছেন- এর অর্থ তাঁর জ্ঞান সাথে আছে। (আশ্‌শারী আহ ২৮৯ পৃষ্ঠা) তাঁর সত্ত্বা নয়। (আস্‌সওয়া-রিকুল মুরসালাহ ২য় খণ্ড ১৫৩পৃষ্ঠা)

ইমাম শাফিঈ (রহঃ) বলেনঃ আল্লাহ পাক আসমানের উপরে আরশের উপর আছেন। সেখান থেকে যেভাবে চান সৃষ্টির নিকটবর্তী হন এবং তিনি (প্রত্যেহ শেষ রাত্রে) দুনিয়ার আসমানে অবতীর্ণ হন যেভাবে খুশী সেভাবে।

ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) বলেনঃ যে ব্যক্তি বলে যে, আল্লাহ পাক আসমানে

না জমিনে সে যেন কুফরী করল। কারণ আল্লাহ পাক বলেছেন "আল্লাহ পাক আরশের উপর আছেন।" তাঁর আরশ সাত আসমানেরও উপরে। তিনি বলেনঃ যদি কেহ বলে, হ্যাঁ সত্যই তিনি আরশের উপর আছেন কিন্তু জানিনা আরশ আসমানে না জমিনে, তাহলে ঐ ব্যক্তিও কাফের। কারণ তিনি যে আসমানে আছেন তা সেই ব্যক্তি অস্বীকার করেছে। আর যে ব্যক্তি অস্বীকার করে যে তিনিআসমানে, সে যেন কুফরি করল। কারণ আল্লাহ পাকআলা ইল্লিয়িনে আছেন। তাকে আমরা উপরের দিকেই হাত তুলে ডাকি, নীচের দিকে নয়। (শরহ আল আকীদাহ আততাহাবিয়া)

(সূত্রঃ ব্যক্তিত্ব সমাজ সংশোধনে ইসলামের দিক নির্দেশনা মুহাম্মাদ জামিল যাইনু- ১৩-১৭ পৃঃ মিনহাজ, আল- ফিরকাতুল নাজীয়্যাহ ২১ ও ২২ পৃষ্ঠা)

তাওহীদ তিন প্রকার

(১) তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ অর্থাৎ প্রভুত্বের ক্ষেত্রে একত্ববাদঃ

তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ হল এই কথা স্বীকার করা যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং দুনিয়ায় একাধিক সৃষ্টিকর্তা নেই। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই রিযিকদাতা ও অন্যান্য সব কিছু দানকারী। আর এ একত্ববাদ চিরসত্য, এতে কোন সন্দেহ নেই। একমাত্র চিরঞ্জীব মহাশক্তিশালী আল্লাহ হচ্ছেন খাদ্যদাতা, জীবনদাতা, আইনদাতা, মৃত্যু দানকারী, বিশ্বজগৎ পরিচালনা ও পুষ্টি সাধনকারী এবং তিনি একাই সবকিছুর প্রতিপালনকারী।

এতে কারো কোন প্রকারের অংশীদারিত্ব নেই। আসমান ও যমীনের সকল প্রাণী তাঁরই দয়ার ভিক্ষুক। তিনিই একমাত্র সকল ক্ষমতার মালিক। দুনিয়ার সকল শক্তি একত্রিত হয়েও আল্লাহর কোন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন বা রদ করতে পারবে না। যদি কেউ মনে করে যে এ রকম গুণ কোন সৃষ্টি জীবের মধ্যে আছে তাহলে সে মুশরিকদের মধ্যে গণ্য হবে। সকল নবী রসূলদের শত্রুরা এই প্রভুত্বের তাওহীদের বিরোধিতা করেছে কেননা এক আল্লাহর প্রভুত্ব মেনে নিলে তাদের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব থাকবে না বলেই তারা বুঝে শুনে চরম ও প্রাণপণ বিরোধিতা করেছে। এখনো মানব রচিত বিধান দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনাকারী শাসকরা একইভাবে বিরোধিতা করছে।

(২) তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ অর্থাৎ ইবাদতের ক্ষেত্রে একত্ববাদঃ

এটা হচ্ছে সে তাওহীদ যেদিকে সকল রাসূলগণ মানুষকে দা'ওয়াত দিয়েছেন। আর তা হলো এক আল্লাহর ই'বাদত করা। আল্লাহ বলেনঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ*

অর্থাৎ অবশ্যই আমি প্রত্যেক উম্মাতের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি এই বলে যে, এক আল্লাহর ইবাদত করো এবং সমস্ত ত্বাগুত থেকে দূরে থাক

(সূরা আন- নাহাল ৩৬ আয়াত)।

এই তাওহীদ হচ্ছে সকল আসমানী কিতাব ঐশীবাণী ও নাবী রাসূলদের প্রদত্ত শিক্ষার সারমর্ম। কিন্তু আগের জাতিগুলো ও উম্মাতে মুহাম্মাদিয়ার অনেকে নাবী ও নেক্কারগণের ক্ববরগুলোকে, গাছ পাথরকে, পীর ফকীরকে, দল, মত ও ব্যক্তিকে আল্লাহর স্থানে বসিয়েছে এবং তাদের নামেই "ইবাদাত করা শুরু করেছে। যেমন তাদের নামে শপথ, তাদের কাছে কান্নাকাটি করা, তাদের নামে পশু জবেহ করা, তাদের নিকট সাহায্য চাওয়া ইত্যাদি।

আর এগুলোই হচ্ছে শিরক। এগুলোর যে কোন একটি করলেই মুশরিক হয়ে যাবে। আর আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র গায়িবের জ্ঞানের অধিকারী। অন্য কোন মালাইকা (ফেরেস্তা), কোন নাবী রাসূল অথবা জ্বীন, অলী, বুযুর্গ গায়িবের অধিকারী নন। তবে নাবী- রাসূলদেরকে মু'জিযা স্বরূপ রিসালাতের বৈশিষ্ট্য রক্ষার্থে আল্লাহ যা কিছু জানিয়ে দিয়েছেন ততটুকুই তাঁরা জানতে পেরেছেন। তাওহীদের দাবী হচ্ছে আমাদের সলাত (নামায) আমাদের সিয়াম (রোযা) আমাদের কুরবানী আমাদের সকল ধরনের "ইবাদাত ও সন্তুষ্টি একমাত্র আল্লাহর জন্যই হতে হবে।

(৩) তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত অর্থাৎ আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর একত্ববাদঃ এটা হলো আল্লাহর নাম সমূহ ও তাঁর গুণাবলীর উপর ঈমান। মহান আল্লাহ যেভাবে তাঁর পবিত্র গ্রন্থে তাঁর ও তাঁর গুণের কথা উল্লেখ করেছেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর হাদীসে আল্লাহর সে গুণের উল্লেখ রয়েছে ঠিক সেভাবেই তাঁর প্রতি ঈমান নিয়ে আসাই হচ্ছে সকল একত্ববাদী ঈমানদারদের একমাত্র পথ। আল্লাহর গুণবাচক নামগুলোর প্রতি সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈ, তাবি- তাবিঈগণ এবং চার ইমাম অনুরূপ বিশ্বাস করেছেন, তাঁরা এতে কোন প্রকার মন্তব্যের অবতারণা করেননি। আল্লাহ তা'আলার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে যেমন আল্লাহর মুখমণ্ডল আছে, তিনি সবকিছু শুনেন ও দেখেন, তিনি আরশে সমাসীন আছেন। আল্লাহর কথা বলা, মহব্বত করা, হাসা, রাগান্বিত হওয়া ইত্যাদি এগুলো যেভাবে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঠিক সেভাবেই তার প্রতি ঈমান নিয়ে আসা প্রত্যেক একত্ববাদীর জন্য অপরিহার্য। আর এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির কখনো সাদৃশ্য হয় না এবং হতেও পারে না। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَىْءٌ* কোন কিছুই তার সাদৃশ্য নয়।

(সূরা আস্-শুরা-১১)

فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ*

সুতরাং তোমরা আল্লাহর কোন সাদৃশ্য স্থির করনা, নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না। (সূরা নাহল-৭৪)

তৃতীয় অধ্যায়

সহীহ্ আক্বীদাহ্ সমূহ

✪ **হায়াত মাওউত ও রিযিকের মালিক আল্লাহ ঃ** আমাদের 'আক্বীদাহ্ পরিশুদ্ধির জন্য এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে যে, আল্লাহ্ জীবিত করেন ও মৃত্যু দেন। তিনিই সব জীবের আহার ও রিযিক্ দাতা। আসমান ও যমীনের সমস্ত প্রাণী তাঁরই অনুগ্রহের দুয়ারে ভিক্ষুক। তিনিই একমাত্র সর্বময় ক্ষমতার মালিক। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে যারা বিপদাপদে ডাকে তারা তাদের উপকার করা তো দূরের কথা, নিজেদের উপকার কিংবা অপকারের মালিকও নয়। এরা সবাই যদি একত্রিত হয়ে কারও ভাগ্য পরিবর্তন করতে চায় তাহলেও তাদের পক্ষে কখনও তা করা সম্ভব হবে না। তক্বদীরের চাবিকাঠি একমাত্র আল্লাহ্র হাতেই ন্যাস্ত।

✪ **নাবী রাসূলগণও রক্ত মাংসে গড়া মানুষ ছিলেন ঃ** নাবী ও রাসূলগণ ছিলেন মানুষ। নেহায়েতই রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ। তাঁরা কেউই নূরের তৈরি ছিলেন না। একবার মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি আঙ্গুল কেটে গিয়ে তা হতে রক্ত ঝরেছিল। বদরের যুদ্ধের সময় তার শিরস্ত্রান ভেঙ্গে তার কপাল দিয়ে রক্ত ঝরেছিল। তাঁরা আহার করতেন, নিদ্রা যেতেন, হাটে বাজারে চলাফিরা করতেন। তারা সকলেই ছিলেন আল্লাহ্র বান্দা বা দাস। তবে পার্থক্য এই যে, তাঁদের উপর আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ ছিল, তাঁদের উপর আল্লাহ্র ওয়াহী নাযিল হত, আল্লাহ্র নিকট হতে বার্তা নিয়ে জিবরাঈল আমীন তাদের কাছে যাতায়াত করতেন। তারা আল্লাহ্র নির্দেশাবলী তাঁর বান্দাদের কাছে ঠিক ঠিক ভাবে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁরা মানুষ হয়েও উম্মাতের জন্য আল্লাহ্র বাণী সঠিকভাবে পৌঁছানোর ব্যাপারে ভুলত্রুটির উর্ধ্বে ছিলেন। উম্মাতের জন্য আল্লাহ্র বাণী সঠিকভাবে পৌঁছানোর ব্যাপারে তারা সৎ ও খাঁটি মানুষ ছিলেন।

✪ **সাহাবাদের মর্যাদা ঃ** উম্মাতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেণীভুক্ত হলেন সাহাবায়ে কিরাম (রাযী আল্লাহু আনহুম), আবার এদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলেন আবূ বাকার সিদ্দীক (রাঃ) অতঃপর উমার ফারূক (রাঃ) তাদের পর উসমান ও আলী (রাঃ) এবং তাদের পর অন্যান্য আশারায়ে মুবাশ্শারাহ। অতঃপর অন্যান্য সাহাবাগণের মধ্যে অনেকেই বিশিষ্ট ও সম্মানিত ছিলেন। অনন্তর সাহাবাদের মধ্যে আপোষে যেসব মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল, সে সব বিষয়ে তাদের সমালোচনা করা আক্বীদাহ্র পরিপন্থী কর্ম। সুতারাং, উহা আমাদের পরিহার করা কর্তব্য। কোন সাহাবার নামে উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে 'রাযী আল্লাহু আনহু' বলা প্রত্যেক উম্মাতে মুসলিমার জন্য পালনীয় বিধি। এ ব্যাপারে শীয়া সম্প্রদায় গলদ বা ভুল ' আক্বীদাহপন্থী। সাহাবা, সাহাবাগণের নিষ্ঠাবান অনুসারীগণ তাবিঈন, ওয়া আয়িম্মায়ে দ্বীন এবং মুজতাহিদগণের এমন কেউ নেই যার সব কথা নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, তাদের কেউই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ওয়াহী প্রাপ্ত নন। অতএব, তাদের কোন বাণী অথবা কার্যকলাপ যদি আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ও

কাজের বিপরীত হয় তাহলে ঐসব ইমাম ও মুজতাহিদগণের কথা পরিত্যাগ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের-কথা ও কাজের অনুসরণ করতে হবে।

✪ **সৃষ্টির পূর্বেই তাক্বদীর নির্ধারিত ঃ** আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আসমান, যমীন সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে মাখলুকের অদৃষ্টলিপি লিখে দিয়েছেন, যা লওহে মাহফুজে সংরক্ষিত আছে, যার কোনো পরিবর্তন নেই। এর নাম তাক্বদীর।

✪ **নাবী রাসূলদের মর্যাদা ও প্রাধান্য ঃ** সকল নাবী ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনা, তাদের কিছু সংখ্যকের কথা কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে এবং অধিকাংশের নামোল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু, তাদের মধ্যে কোনরূপ তারতম্য না করে বিনা দ্বিধায় সকলকে বিশ্বাস করা। নাবী ও রাসূলগণের মধ্যে অনেকে বিশেষ বিশেষ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল, আখিরী নাবী, খাতামুন নাবিইয়ীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

✪ **ঈমান কমে ও বাড়ে ঃ** সৎ কর্মে ঈমান বাড়ে এবং অসৎ কর্মে ঈমান কমে। ঈমান-'আক্বীদাহ্ হল অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা এবং কাজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার নাম। অন্তর হতে ঈমান দূরীভূত না হয়ে যায় এই ভয় বা আশংকা থাকাও ঈমান। অন্তর হতে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়-সাহাবা (রাঃ)-এর এই ভীতি ছিল সর্বক্ষন। তাবিঈ আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবি মুলাইকা বলেন ঃ আমি ৩০ (ত্রিশ) জন সাহাবীকে পেয়েছি, যারা নিজেরা মুনাফিক্ হয়ে যাওয়ার ভয়ে সদা শংকিত থাকতেন। এই আশংকা করা মুসলিমের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, আর ঐরূপ আশংকা থেকে মুক্ত থাকা মুনাফিকের আলামত বলে তারা মনে করতেন। (বুখারী)

✪ **ক্বীরাহ গুনাহের জন্য মূ'মিন ঈমান হতে খারিজ নয় ঃ** ক্বীরা গুনাহগার মু'মিন ঈমান হতে খারিজ নয়। সে তওবাহ না করে মারা গেলেও স্থায়ীভাবে জাহান্নামী নয়। আল্লাহ শিরক ব্যতীত বান্দার যে কোন গুনাহ্ মাফ করে থাকেন। গুনাহের কারণে তাকে 'গুনাহগার ' (عَاصِي) " ফাসিক্ব' (فَاسِقٌ) ইত্যাদি বলা যাবে। কিন্তু " পূর্ণ মূ'মিন' (مُؤْمِنٌ حَقٌّ) কিংবা 'কাফির'(كَافِرٌ) বলা যাবে না। একজন ঘুমন্ত ব্যক্তি মৃত্যের ন্যায় হ'লেও তাকে যেমন প্রাণহীন মৃত বলা যায় না, তেমনি গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে ঈমানের দীপ্তি স্তিমিত হয়ে গেলেও কোন মু'মিনকে ঈমানশূন্য কাফির বলা যায় না। তাছাড়া ক্বিয়ামাতের দিন নাবীর শাফা'আত তো মূলত ঃ কবীরা গুনাহগার মূ'মিনদের জন্যই হবে। (আহ্লে হাদীস আন্দোলন- ডঃ আসাদুল্লাহ আল-গালীব-১০৪-১০৫)

✪ **ক্বিবলার অনুসারী সবাই কি মু'মিন ও মুসলিম ঃ** আমাদের ক্বিবলাকে (বায়তুল্লাহ্) যারা ক্বিবলা বলে স্বীকার করে আমরা তাদেরকে মুসলিম ও মু'মিন বলে আখ্যায়িত করি যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নাবী কর্তৃক প্রবর্তিত শরী'আতকে স্বীকার করে এবং তিনি যা কিছু বলেছেন তাকে সত্য বলে গ্রহণ করে। কোন গুনাহ্র কারণে কোন আহ্লে ক্বিবলাকে (মুসলিমকে) কাফির বলে অভিহিত করি না যতক্ষণ না সে উক্ত গুনাহ্কে হালাল (জায়িয) মনে করে। (আক্বীদাহ তাহাভী-২২ পৃষ্ঠা)

✪ মুসলিমের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা ঃ উম্মাতে মুহাম্মাদীয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করাকে আমরা জায়িয মনে করি না। তবে হ্যাঁ, যদি তা কারও উপরে ওয়াজিব হয়ে থাকে (শারী'আতের কারণে) তাহলে তা ভিন্ন কথা।

✪ কেউ ধর্মের বিরোধী বা তার বিধানের সাথে ঠাট্টা -বিদ্রুপ করলে সে কাফির ঃ ধর্মের সাথে ঠাট্টা করা, ধর্ম বা ধর্মীয় কোন বিধানের বিষয়ে এমন কিছু বলা যা দ্বারা ধর্মকে হেয় করা বা ধর্মের মর্যাদা হানি করা হয়। যেমন, দাড়ি রাখা, মহিলাদের পর্দায় চলা (বোরকা পরিধান করা) বা পুরুষের টাখনুর উপর কাপড় পরিধানকে ধর্মীয় বিধান জেনেও ঠাট্টা করা। অনুরূপ যে কোন বিষয় যা সহীহ শুদ্ধভাবে দ্বীন হিসাবে প্রমাণিত তার সাথে ঠাট্টা-তামাশা করা উক্ত হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর প্রেরিত কিতাব, তাঁর রাসূল বা দ্বীন সম্পর্কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে, সে কাফির হয়ে যাবে। যদি প্রকৃতপক্ষে উপহাস করা তার উদ্দেশ্য নাও হয়, তামাশাচ্ছলেই ঠাট্টা করে থাকে। এ বিষয়ে সকল আলিমের ঐকমত্য রয়েছে।

(সূত্র ঃ ঈমান বিধ্বংসী বিষয়- ২৫, ২৬)

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন "যে ব্যক্তিগণ, যাদুকর, বা কোন ভবিষ্যৎবাণীকারকদের নিকট যাবে এবং তাকে জিজ্ঞাসা করবে, অতঃপর গণকের কথা বিশ্বাস করবে, সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তার সাথে কুফরী করল।" অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসের প্রতি অবিশ্বাসী হল। ইসলাম বা ঈমানের কোন রুকন (স্তম্ভ)-কে অস্বীকার করা । যেমন সলাত, সিয়াম, হাজ্জ ও যাকাত ইত্যাদি। অনুরূপ আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনা, তাঁর মালাইকাগণ (ফেরেশতাগণ প্রেরিত কিতাব সমূহ, ক্বিয়ামত দিবস, ভাগ্যের ভাল-মন্দ ইত্যাদি ধর্মের যেসব বিষয় জানা একান্ত জরুরী এসবের কোন একটির অস্বীকারকারী কাফির হয়ে যাবে। তেমনি কুরআন ও সুন্নাহর সামান্য কিছু অস্বীকারকারী মুরতাদ হয়ে যাবে। ধর্মকে রাষ্ট্র হতে পার্থক্য করাও কুফরীর অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ এমনটি করা যে, ইসলাম ধর্মে কোন রাজনীতি নেই, ধর্ম ও রাজনীতি সম্পূর্ণ পৃথক। উক্ত ধারণার মাধ্যমে কুরআন-হাদীস ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়। বরং রাজনীতি ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ বিশেষ। কারণ ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ ও সর্বোত্তম জীবন বিধান। (সূত্র ঃ ঈমান বিধ্বংসী বিষয়- ৩৩, ৩৪ পৃষ্ঠা)

✪ যে মুশরিকদের কাফির মনে করে না অথবা অন্য ধর্ম বা মতবাদকে সত্য মনে করে সে কাফির ঃ যেমন, কেউ যদি কোন ইয়াহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ বা নাস্তিককে অথবা অন্য যে কোন স্পষ্ট শিরককারীকে কাফির মনে না করে, এই ভেবে যে-তারাও তো আল্লাহকে স্বীকার করে, বা কোন এক প্রকারের 'ইবাদতে লিপ্ত থাকে, বা অন্য কোন কারণেই হোক না কেন ; তাহলে ঐ ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে। (সূত্র ঃ ঈমান বিধ্বংসী বিষয়-১৫)

অনুরূপ কেউ যদি কোন সুস্পষ্ট কাফিরের কুফরীতে সন্দেহ পোষণ করে, অর্থাৎ সে কি কাফির ? না কাফির নয়, এমন দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকে, তাহলে ঐ ব্যক্তিও কাফির হয়ে যাবে এমনি যদি কেউ কাফিরদের ধর্মকে সঠিক মনে করে, অর্থাৎ এ ধারণা করে

যে তারাও সঠিক পথেই আছে। তাহলে উক্ত ব্যক্তিও কাফির হয়ে যাবে। কারণ এরূপ ধারণাকারীর নিকটে এ বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে যে, ইসলামই একমাত্র আল্লাহর মনোনীত সঠিক দ্বীন, আর তা ছাড়া সবই বাতিল। (সূত্র ঃ ঈমান বিধ্বংসী বিষয়-২৩)

✪ মু'জিযা ও কারামাত ঃ নাবী ও রসূলগণের মু'জিযা ও মু'মিনদের কারামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা জরুরী। অবশ্য মু'জিযা ও কারামতের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যেমন, মু'জিযার প্রতি চ্যালেঞ্জ এসেছে, কিন্তু কারামতের প্রতি কোনো চ্যালেঞ্জ আসেনি। মু'জিযা হল নাবী ও রাসূলগনের নবুওয়াত ও রিসালাতের বৈশিষ্ট্য যেমন কুরআন মাজীদ এক অবিস্মরণীয় মু'জিযা, যা দিয়ে বিশ্ববাসীকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। আর মু'মিনগণ বিশেষ বিশেষ সময়ে কারামত অর্জন করে থাকেন। অবশ্য জিন-শয়তানের মারফত অনেক মানুষের মধ্যে অলৌকিক কিছু প্রকাশ পেলেও তা কারামত নয়। বরং সেটা ভেলকিবাজী বা যাদু। জিন শয়তানের সহায়তা অনেক অমুসলিম যাদু ও ভেলকির মাধ্যমে অনেক সময় অলৌকিক কর্মকাণ্ড করে থাকে। এগুলি কখনও কারামত নয়।

✪ মৃত্যু ব্যক্তির নিকট কামনা না করা ঃ মুসলিম দাবিদারদের একটি শ্রেণী মৃত ব্যক্তিদের ক্বরে এই জন্য উপস্থিত হয় যে, তাদের ' আক্বীদাহ্ মতে ঐ সব মৃত ব্যক্তি জগতের কুতুব, অর্থাৎ তারা মানুষের অভাব অভিযোগ শুনে সেসব আল্লাহ্র নিকট পৌঁছে দেয় এবং তাদের মনস্কামনা পূর্ণ করার সুপারিশকারী হিসাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। এই মুশরিকী 'আকীদাহ্ পোষণকারী ভারত-বাংলা উপ-মহাদেশের এক শ্রেণী নামধারী মুসলিম। তাদের উদ্দেশ্য সফল করার খাজা বাবার দরবার নামক স্থান আজমীরে হাযির হয়। এদের সম্পর্কে ভারত গুরু শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহলভী (রহঃ) বলেছেন ঃ যারা তাদের মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ার অভিলাষে আজমীর অথবা সা-লার মাসউদ এর ক্বরে যাতায়াত করে তারা নর হত্যা ও ব্যভিচার অপেক্ষা বড় পাপে লিপ্ত হল। (তাফহীমাতে ইলাহিয়াহ)।

তাদের উদাহরণ হল আরবের ঐ সমস্ত মুশরিকদের ন্যায় যারা তাদের মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ার আশায় লাত-উয্যাকে ডাকত। অনেকের মন্তব্য এই যে, তাদের ধারণায় অলীগণ শুন্য জগতে বিচরণ করে থাকে এবং দূর-দূরান্ত হতে ভক্তদের অন্তরের বাসনা, কামনা, উদ্বেগ ইত্যাদির খবরা-খবর পেয়ে তাদের বিপদ হতে উদ্ধার করে থাকে। আর এসব ধারণা মূলত ঃ আল্লাহ্র সাথে শির্ক ফীল-ইল্ম ও শির্ক ফীত তাসাররূফ এর শামিল। ঠিক এভাবেই তারা পীর মুর্শিদকে ক্ষুদে মা'বুদ বানিয়ে আল্লাহ্র আসনে বসিয়েছেন।

কোন মানুষের সম্পর্কে গাউস হওয়ার আক্বীদাহ্ পোষণ করা অনুরূপ শির্ক। শায়খ আব্দুল ক্বাদির জিলানী (রহঃ)-কে গাউস পাক, গাউসে আযম বা গাউসুস সাকালায়েন ইত্যাদি খিতাবে বিভূষিত করা অথবা আহ্বান করা জঘন্য শির্ক।

✪ মৃত্যুর পরের প্রশ্ন ঃ মৃত্যুর পর মানুষকে তিনটি বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে ঃ (১) তার রব্ব সম্পর্কে (২) তার দ্বীন বা ধর্ম সম্পর্কে এবং (৩) তার রাসূল সম্পর্কে। এই সব প্রশ্নের জবাবের ভিত্তিতে তার ক্বরে আল্লাহ্র আযাব বা শাস্তি কিংবা তাঁর করুণা বা রাহমাত বর্ষিত হবে। এসবের প্রতি ঈমান রাখতে হবে।

✪ **অনুসরণের মূলনীতি ঃ** (১) মুসলিমদের একমাত্র অনুসরণীয় ইমাম ও নেতা হচ্ছেন মুহাম্মাদুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, অন্য কোন ব্যক্তি নয় এবং হতেও পারে না। (২) মুসলিমদের সকল প্রকার আইন, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সহ সকল সমস্যার সমাধানে একমাত্র কুরআন-হাদীস অনুসরণ করতে হবে। (৩) কোন সমস্যার সমাধান সরাসরি কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের ভিতর না পেলে সে সম্পর্কে সাহাবাগণের সম্মিলিত সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করতে হবে। (৪) যে সকল বিষয় কুরআন, সহীহ্ হাদীস ও সাহাবাগণের ইজমার (ঐক্যমত) মধ্যে নহে, সে সকল বিষয়ে কুরআন ও হাদীসকে ভিত্তি করে আলিমগণ ইজতিহাদ (শরীয়াত গবেষণা) করবেন। কুরআন ও হাদীস বিরোধী কোন ইজতিহাদ গৃহীহ হবে না এবং কোন ইজতিহাদ কুরআন ও সুন্নাহ এবং সাহাবাগণের ইজমা (ঐকমত্য) এর স্থান অধিকার করার যোগ্য বিবেচিত হবে না। (৫) কোনভাবেই ধর্মীয় ব্যাপারে দলীল ছাড়া কারো উক্তির অনুসরণ করা চলবে না।

✪ **সিয়াম, হাজ্জ ও যাকাত যথার্থভাবে আদায় ও প্রদান করা ঃ** অতঃপর বছরের রামাযানুল মুবারকের একমাস সিয়াম পালন করা যে ফরয তার প্রতি দৃঢ় ঈমান পোষণ করা; অতঃপর শারীয়াহ্ কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ সম্পদ থাকলে যাকাত দেয়া ও সামর্থ থাকলে হাজ্জ করা ইত্যাদি ফরয হওয়ার প্রতি সুদৃঢ় ঈমান পোষণ করা অতি অবশ্যক। যারা সম্পদ থাকতেও যাকাত দেয় না কিংবা সামর্থ থাকতে হাজ্জ করে না তারা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে না।

✪ **লাওহে মাহফুযে সবকিছুই লিপিবদ্ধ আছে ঃ** লাওহে মাহফুয এবং তাতে যা কিছু লিখিত হয়েছে তা আমরা বিশ্বাস করি। আমরা আরও বিশ্বাস করি কলমের প্রতি। যা হবে বলে আল্লাহ্ লাওহে মাহ্ফুয়ে লিখে রেখেছেন তা হবেই। সমস্ত সৃষ্টজীব একত্রিত হয়েও রোধ করতে পারবে না। পক্ষান্তরে, তাতে যে বিষয় তিনি লিখেননি সমস্ত সৃষ্টজীবন একত্রিত হয়েও তা ঘটাতে পারবে না। যা প্রলয় দিবস পর্যন্ত ঘটবে তা লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে এবং কলমের কালি শুকিয়ে গেছে। যা বান্দার ভাগ্যে লেখা হয়নি, তা সে কখনই পারবে না এবং যা বান্দার নসীবে লিখা আছে, তা হবেই হবে। বান্দার একথা জেনে রাখা উচিত যে, তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত যাবতীয় ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ্ পূর্ব হতে অবহিত রয়েছেন। অতএব, তিনি তাকে তাদের জন্য অকাট্য ও অবিচল ভাগ্য হিসাবে নির্ধারিত করেছেন। এটাকে কেউ বানচাল করতে পারবে না, একে কেউ অপসারিত অথবা পরিবর্তিতও করতে পারবে না। আসমান ও যমীনের কোন মাখলুক একে সংকুচিত কিংবা বর্ধিত করতে পারবে না। (আক্বীদাহ তাহাভী-২০ পষ্ঠা)

আল্লাহ বলেন ঃ "তিনি সমস্ত বস্তুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি সব কিছুরই ঊর্ধ্বে সৃষ্টিজগত তাঁকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে অক্ষম।"

✪ **মি'রাজ সত্যঃ** মুহাম্মদকে নৈশকালে ভ্রমণ করান হয়েছিল, তাঁকে জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে ঊর্ধ্ব আকাশে উত্থিত করা হয়েছিল। সেখান থেকে আল্লাহ্র ইচ্ছা অনুসারে আরও ঊর্ধ্বে নেয়া হয়েছিল। সেখানে আল্লাহ্ স্বীয় ইচ্ছা অনুসারে তাঁকে

সম্মান প্রদর্শন করেছেন এবং তাঁকে যা প্রত্যাদেশ করার ছিল তা করেছেন। "তার অন্তর যা দেখেছিল তা মিথ্যা নয়।" আল্লাহ্ তাঁর নবীর প্রতি অনুগ্রহশীল হউন দুনিয়া ও আখিরাতে। (আক্বীদাহ তাহাভী-১৮)

✪ **যে যেটার উপযুক্ত সেটাই তার সহজ হবে ঃ** অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে পূর্ব হতেই অবহিত এবং যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সে কাজ তার জন্য সহজ সাধ্য। শেষ কর্ম দ্বারা মানুষের কৃতকার্যতা বিবেচিত হবে এবং ভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্র ফায়সালায় ভাগ্যবান বলে সাব্যস্ত হয়েছে। আর হতভাগ্য সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্র ফায়সালায় হতভাগ্য বলে নিরুপিত হয়েছে। (আক্বীদাহ তাহাভী- ১৯)

✪ **শুধুমাত্র কুরআন সুন্নাহকেই মেনে চলা ঃ** আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যে সকল নির্দেশ কুরআন ও সহীহ্ হাদীসে প্রমাণিত রয়েছে তা মানার জন্য কোন ওলি, পীর, দরবেশ, মুজতাহিদ, ফকীহ্ বিদ্বান, দার্শনিক ও শাসকের ব্যক্তিগত বা দলীয় অনুমতি বা নিষেধের প্রতিক্ষা না করে সেগুলি মানা ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোন দেশাচার ও প্রথা অথবা কারো ব্যক্তিগত বা দলীয় বিধি নিষেধ ও বাধা বিপত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত না করা।

বিজাতীয় আদর্শ যেমন, পুঁজিবাদ, সমাজবাদ, ধর্মনিরপেক্ষবাদ, জাতিয়তাবাদ ও ধর্মের নামে মাযহাবী মতবাদ এর অনুসরণ থেকে মুক্ত থাকা।

✪ **জান্নাতী ও জাহান্নামী আখ্যায়িত করা ঃ** আমরা কাউকে জান্নাতী ও জাহান্নামী বলে আখ্যায়িত করব না এবং কারও বিরুদ্ধে আমরা কুফরী ও শিরকের অথবা নিফাকের সাক্ষ্য প্রদান করব না, যতক্ষণ না এগুলির কোন একটি তাদের মধ্যে প্রকাশ্যে দৃষ্টিগোচর হয়। তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার আমরা আল্লাহ্র উপর ছেড়ে দিই।

✪ **সকল ইমামের পিছনে সলাত আদায় করা ঃ** ভাল-মন্দ সকল ইমামের পিছনে সলাত আদায় করা জায়িয আল্লাহ বলেন-'তোমরা রুকুকারীদের সাথে রুকু কর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- 'ভাল-মন্দ প্রত্যেক মুসলিমদের পিছনে তোমাদের জন্য সলাত আদায় ওয়াজিব। যদি তিনি কবীরা গুনাহগারও হন। বিদ্রোহী ফাসিক দল কর্তৃক মদীনা অবরোধের সময় তাদের পিছনে সলাত আদায়ে অনিচ্ছুক মু'মিনদেরকে নিয়মিত জামা'আতে সলাত আদায়ের নির্দেশ দিয়ে খলীফা উসমানগণী (রাঃ)- বলেছিলেন- ' মানুষের সমস্ত আমলের মধ্যে সলাতই সর্বোত্তম। অতএব, যখন কেউ এই উত্তম কাজটি করে , তখন তোমরা তাদের অনুগামী হও এবং তাদের মন্দ কর্তৃক মক্কা নগরী আবরোধকালে সাহাবী আবদুল্লাহ বিন ওমার (মৃঃ ৭৪হিঃ)-বিদ্রোহী সৈন্যদের পিছনে সালাত আদায় করতেন। (আহ্লে হাদীস আন্দোলন-আসাদুল্লাহ আল-গালীব-১১০-১১১)

প্রত্যেক নেক ও ফাজের মুসলিমের পিছনে সলাত আদায় করা এবং প্রত্যেক মৃত মুসলিমের জন্য জানাযার সলাত আদায় করা জায়িয বলে আমরা মনে করি। (আক্বীদাহ তাহ্ভী)

✪ দীনের স্তম্ভ সলাতের হিফাযাত ঃ পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ফরয হওয়ার প্রতি দৃঢ় ঈমান রেখে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশিত নিয়মে যথা ওয়াক্তে সলাত আদায় করা আবশ্যক। কেননা, সলাতকে কুরআন মাজীদে ঈমান বলা হয়েছে। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ اَلصَّلاَةُ عِمَادُ الدِّيْنِ সলাত দ্বীন ইসলামের স্তম্ভ স্বরূপ। স্তম্ভ ব্যতীত যেমন ঘর থাকে না, সলাত ব্যতীত তেমনি দীন ইসলাম থাকে না। তাই দ্বীন ইসলাম রক্ষার্থে বেহুঁশ হওয়া ব্যতীত উহা আদায় করা সর্বাবস্থায় ফরয। অসুস্থ হলে বসে এবং তাতেও অপরাগ হলে বিছানায় শুয়ে ইশারায় তা আদায় করতে হবে। অর্থাৎ সর্বস্থলে, সর্বাবস্থায় এবং যথাযথ ওয়াক্তে সর্বদা সলাত আদায় করা ফরয।

✪ পরকালে যা হবে তা সত্যি ঃ আমরা পুরুত্থান দিবস, 'আমলের প্রতিফল, হিসাব নিকাশ, 'আমলনামা পাঠ , সওয়াব (প্রতিদান) শাস্তি, পুলসিরাত এবং মীযান (দাঁড়িপাল্লা) এসবই সত্য বলে বিশ্বাস করি। (আক্বীদাহ্ তাহাভী-২৪, ২৫, ২৬ পৃষ্ঠা)

✪ জ্যোতিষী ও ভবিষ্যত বক্তাদের কথা সত্য নয় ঃ আমরা কোন ভবিষ্যৎ বক্তা অথবা কোন জ্যোতিষীকে সত্য বলে মনে করি না এবং ঐ ব্যক্তিকেও সত্য বলে মনি করি না, যে আল্লাহ্‌র কিতাব, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ্ ও উম্মতের ইজমার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখে। (আক্বীদাহ্-৩০ পৃষ্ঠা)

✪ ক্বিয়ামাতের নিদর্শন সত্যি ঃ আমরা ক্বিয়ামাতের নিম্নলিখিত নিদর্শনাবলীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিঃ দাজ্জালের আবির্ভাব , আসমান হতে ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ, পশ্চিম গগনে সুর্যোদয় এবং দাব্বাতুল আরয্ নামক প্রাণী স্বীয় স্থান হতে আবির্ভাব।

اٰخِرُهٗ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ حَمْدًا كَثِيْرًا

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ১। তাফসীর ইবনু কাসির ২। বুখারী ৩। মুসলিম ৪। তিরমিযী ৫। ইবনু মাজাহ ৬। আহমাদ ৭। ঈমান ও আক্বীদা- অধ্যাপক হাফেয শায়খ মাওলানা আইনুল বারী ৮। রসূল (সাঃ) এর সলাত এবং আক্বীদা ও জরুরী সহীহ্ মাস্আলা- আবূ মুহাম্মাদ আলীমুদ্দিন নদীয়াভী ৯। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামআতের আক্বীদাহ ও বিশ্বাস- শায়খ মুহাম্মাদ সালেহ আল উসাইমীন ১০। সহীহ আক্বীদা ও উহার পরীপন্থী বিষয়-শায়খ আব্দুল আযিয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায ১১। মিনহাজ আল-ফিরকাতুন নাজিয়্যাহ- মুহাম্মাদ বিন জামিল যাইনু ১২। আহলে হাদীস পরিচিতি- আল্লামা আব্দুল্লাহিল কাফি আল-কুরাইশি ১৩। প্রশ্নউত্তরে ইসলামী আক্বীদা- আ. ন. ম রশীদ আহমাদ ১৪। আক্বীদাহ তাহাবী ১৫। আহলে হাদীস আন্দোলন ও দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত- ডঃ আসাদুল্লাহ আল- গালিব। ১৬। ঈমান বিধ্বংসী বিষয়- মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ১৭। আহলে হাদীসদের পরিচয় ও ইতিহাসা এবং মাজহাব প্রসঙ্গ- হাফেয মুহাম্মাদ আইয়ূব ১৮। তাওহীদ ও শির্ক, সুন্নাত ও বিদ'আত- ঐ

সমাপ্ত

0001